যদ্দ্বারা সত্য ও মিথ্যা দাবীর ফয়সালা হয় অথবা স্বয়ং তওরাতই এর অর্থ। কেননা এর মধ্যে গ্রন্থ ও মীমাংসাকারীর জন্য প্রয়োজনীয় উভয় গুণ ও বৈশিষ্ট্যের সমাবেশ রয়েছে।

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم
بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ
خَيْرٌ لَّكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ
الرَّحِيمُ ﴿٥٤﴾

(৫৪) আর যখন মূসা তাঁর সম্প্রদায়কে বলল, হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা তোমাদেরই ক্ষতি সাধন করেছ এই গো-বৎস নির্মাণ করে। কাজেই এখন তওবা কর স্বীয় স্রষ্টার প্রতি এবং নিজ নিজ প্রাণ বিসর্জন দাও। এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর তোমাদের স্রষ্টার নিকট। তারপর তোমাদের প্রতি লক্ষ্য করা হল। নিঃসন্দেহে তিনিই ক্ষমাকারী, অত্যন্ত মেহেরবান।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর (সে সময়ের কথাও স্মরণ কর,) যখন মূসা (আ) স্বীয় সম্প্রদায়কে বললেন, হে আমার সম্প্রদায়, নিশ্চয়ই তোমরা গো-বৎস পূজার ব্যবস্থা ও প্রচলন করে নিজেদের ভয়ানক ক্ষতি সাধন করেছ। এখন তোমরা তোমাদের স্রষ্টার প্রতি ফিরে আস। অতঃপর তোমাদের কেউ কেউ (যারা গো-বৎস পূজায় অংশ গ্রহণ করনি) অন্যদেরকে (যারা গো-বৎস পূজায় অংশ নিয়েছিল) হত্যা কর। এ নির্দেশ (কার্যে পরিণত করা) তোমাদের সৃষ্টিকর্তার নিকটে তোমাদের জন্য শুভ ও মঙ্গলজনক হবে। অতঃপর (তা কার্যে পরিণত করলে) আল্লাহ্ পাক তোমাদের অবস্থার প্রতি (কৃপাদৃষ্টিসহ) লক্ষ্য দেবেন। নিঃসন্দেহে তিনি তো এমনই যে, তওবা কবুল করে নেন এবং করুণা বর্ষণ করেন।

জ্ঞাতব্য ঃ এটা তাদের তওবার জন্যে প্রস্তাবিত পদ্ধতির বর্ণনা---অর্থাৎ অপরাধিগণকে হত্যা করে দেওয়া। আমাদের শরীয়তেও এমন কোন কোন অপরাধের জন্য তওবা করা সত্ত্বেও মৃত্যুদণ্ড বা শারীরিক দণ্ডের ব্যবস্থা রয়েছে। যেমন,

ইচ্ছাকৃত হত্যার শাস্তি হত্যা। সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণিত যিনার (ব্যভিচার) শাস্তি 'রজ্‌ম' বা পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করা। তওবার দ্বারা এ শাস্তি থেকে অব্যাহতি নেই। বস্তুত তারা এ নির্দেশ কার্যে পরিণত করেছিল বলে পরকালে দয়া ও করুণার অধিকারী হয়েছে।

وَإِذْ قُلْتُمْ يٰمُوسٰى لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى نَرَى اللّٰهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصّٰعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ ۝٥٥

(৫৫) আর যখন তোমরা বললে, হে মূসা, কস্মিনকালেও আমরা তোমাকে বিশ্বাস করব না, যতক্ষণ না আমরা আল্লাহ্‌কে (প্রকাশ্য) দেখতে পাব। বস্তুত তোমাদিগকে পাকড়াও করল বিদ্যুৎ। অথচ তোমরা তা প্রত্যক্ষ করছিলে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর (সে সময়টির কথা স্মরণ কর) যখন তোমরা বলছিলে, হে মূসা, আমরা (শুধু) তোমার বলাতে কখনো মানব না (যে, এটি আল্লাহ্‌র বাণী), যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা (স্বচক্ষে) আল্লাহ্‌কে স্পষ্টভাবে দেখতে না পাব। সুতরাং (এ ধৃষ্টতার জন্য) তোমাদের উপর বজ্রপাত হলো, যা তোমরা স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছিলে।

জ্ঞাতব্য ঃ ঘটনা এই---যখন হযরত মূসা (আ) তূর পর্বত থেকে তওরাত নিয়ে এসে বনী-ইসরাঈলের সামনে পেশ করে বললেন যে, এটা আল্লাহ্ প্রদত্ত কিতাব, তখন কিছু সংখ্যক উদ্ধত লোক বলল, যদি আল্লাহ্ স্বয়ং বলে দেন যে, এ কিতাব তাঁর প্রদত্ত তবে অবশ্যই আমাদের বিশ্বাস এসে যাবে। মূসা (আ) আল্লাহ্‌র অনুমতি-ক্রমে এতদুদ্দেশ্যে তাদেরকে তূর-পর্বতে যেতে বললেন। বনী-ইসরাঈলরা সত্তর জন লোককে মনোনীত করে হযরত মূসা (আ)-র সঙ্গে তূর পর্বতে পাঠাল। সেখানে পৌঁছে তারা আল্লাহ্‌র বাণী স্বয়ং শুনতে পেল। তখন তারা নতুন ভান করে বলল, শুধু কথা শুনে তো আমাদের তৃপ্তি হচ্ছে না---আল্লাহ্‌ই জানেন এ কথা কে বলছে। যদি আল্লাহ্‌কে দেখতে পাই, তবে অবশ্যই মেনে নেব। কিন্তু যেহেতু এ মরজগতে আল্লাহ্‌কে দেখার ক্ষমতা কারো নেই, কাজেই এ ধৃষ্টতার জন্য তাদের উপর বজ্রপাত হল এবং সবাই ধ্বংস হয়ে গেল। তাদের এ ধ্বংসপ্রাপ্তির বর্ণনা পরবর্তী আয়াতে রয়েছে।

ثُمَّ بَعَثْنٰكُمْ مِّنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝٥٦

(৫৬) তারপর মরে যাবার পর তোমাদিগকে আমি তুলে দাঁড় করিয়েছি, যাতে করে তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে নাও।

তফসীরের সারসংক্ষেপ

অতঃপর আমি (হযরত মূসা [আ]-র বদৌলত) মরে যাওয়ার পর তোমাদেরকে পুনর্জীবিত করলাম এ আশায় যে, তোমরা অনুগ্রহ স্বীকার করে নেবে।

জ্ঞাতব্য ঃ 'মউত' শব্দ দ্বারা পরিষ্কার বোঝা যায় যে, তারা বজ্রপাতের ফলে মৃত্যুবরণ করেছিল। তাদের পুনর্জীবিত হওয়ার ঘটনা এরূপ—মূসা (আ) আল্লাহ্‌র দরবারে নিবেদন করলেন, বনী-ইসরাঈল এমনিতে আমার প্রতি কুধারণা পোষণ করে থাকে। এখন তারা ভাববে যে, এ লোকগুলোকে কোথাও নিয়ে গিয়ে কোন উপায়ে আমিই স্বয়ং তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছি। সুতরাং আমাকে মেহেরবানীপূর্বক এ অপবাদ থেকে রক্ষা করুন। তাই আল্লাহ্ পাক দয়াপরবশ হয়ে তাদেরকে পুনর্জীবিত করে দিলেন।

وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ۖ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٥٧﴾

(৫৭) আর আমি তোমাদের উপর ছায়া দান করেছি মেঘমালার দ্বারা এবং তোমাদের জন্য খাবার পাঠিয়েছি 'মান্না' ও 'সালওয়া'। সেসব পবিত্র বস্তু তোমরা ভক্ষণ কর, যা আমি তোমাদেরকে দান করেছি। বস্তুত তারা আমার কোন ক্ষতি করতে পারেনি, বরং নিজেদেরই ক্ষতি সাধন করেছে।

তফসীরের সারসংক্ষেপ

আর আমি মেঘমালাকে (তীহ্ প্রান্তরে) তোমাদের উপর ছায়া প্রদানকারী করে দিলাম এবং (আমার অদৃশ্য ধনভাণ্ডার থেকে) তোমাদের প্রতি মান্না ও সালওয়াসমূহ

পৌঁছাতে লাগলাম (এবং তোমাদেরকে অনুমতি দিলাম) যে, তোমরা সেসব উৎকৃষ্ট বস্তু থেকে ভক্ষণ কর, যা আমি তোমাদেরকে খাবার হিসাবে প্রদান করছি। (কিন্তু তারা এক্ষেত্রেও অঙ্গীকার লংঘন করে বসল) এবং (এর ফলে) তারা আমার কোন অনিষ্ট সাধন করতে পারেনি বরং নিজেদেরই ক্ষতি সাধন করছিল।

জ্ঞাতব্য ঃ উভয় ঘটনাই ঘটেছিল তীহ্ প্রান্তরে। তার বিস্তারিত বর্ণনা এই যে, বনী-ইসরাঈলের আদি বাসস্থান ছিল শাম দেশে। হযরত ইউসুফ (আ)-এর সময়ে তারা মিসরে এসে বসবাস করতে থাকে। আর 'আমালেকা' নামক এক জাতি শাম দেশ দখল করে নেয়। ফেরাউনের ডুবে মরার পর যখন এরা শান্তিতে বসবাস করতে থাকে, তখন আল্লাহ্ পাক আমালেকাদের সাথে জিহাদ করে তাদের আদি বাসস্থান পুনর্দখল করতে নির্দেশ দিলেন। বনী-ইসরাঈল এতদুদ্দেশ্যে মিসর থেকে রওয়ানা হল। শামের সীমান্তে পৌঁছার পর আমালেকাদের শৌর্য-বীর্যের কথা জেনে তারা সাহস হারিয়ে হীনবল হয়ে পড়ল এবং জিহাদ করতে পরিষ্কার অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করল। তখন আল্লাহ্ পাক তাদেরকে এ শাস্তি প্রদান করলেন, যাতে তারা একই প্রান্তরে চল্লিশ বছর হতবুদ্ধি হয়ে দিক-বিদিক জ্ঞানশূন্যভাবে বিচরণ করতে থাকে। ঘরে ফেরা আর তাদের ভাগ্যে জুটেনি।

এ প্রান্তরে কোন বিশাল ভূ-খণ্ড ছিল না। 'তীহ্' প্রান্তর মিসর ও শাম দেশের মধ্যবর্তী দশ মাইল এলাকাবিশিষ্ট একটি ভূ-ভাগ। বর্ণিত আছে, এরা নিজেদের বাস-স্থান মিসরে পৌঁছার জন্য সারা দিন চলতে থাকত, রাতে কোন মঞ্জিলে অবস্থান করত। কিন্তু ভোরে উঠে দেখতে পেত—যেখান থেকে যাত্রা শুরু করেছিল সেখানেই রয়ে গেছে। এভাবে চল্লিশ বছর পর্যন্ত এ প্রান্তরে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে শ্রান্ত ও ক্লান্তভাবে বিচরণ করছিল।

এই 'তীহ্' উপত্যকা ছিল এক উন্মুক্ত প্রান্তর। এখানে কোন লোকালয় বা গাছ-বৃক্ষ ছিল না—যার নিচে শীত-গরম বা সূর্যতাপ থেকে আশ্রয় নেওয়া চলে। তেমনি-ভাবে এখানে পানাহারের উপকরণ বা পরিধানের বস্ত্রসামগ্রীও কিছুই ছিল না। কিন্তু আল্লাহ পাক হযরত মূসা (আ)-র দোয়ার বদৌলতে মু'জিযা হিসাবে যাবতীয় প্রয়োজন মেটাবার ব্যবস্থা করে দেন। বনী-ইসরাঈল সূর্যতাপের অভিযোগ করলে আল্লাহ্ পাক হাল্কা মেঘখণ্ড দিয়ে তাদের ওপর ছায়ার ব্যবস্থা করে দেন। ক্ষুধা পেলে তাদের জন্য 'মান্না ও সালওয়া' (তুরাঞ্জাবীন ও বাটের পাখী) অবতীর্ণ করতে থাকেন। গাছপালার ওপর পর্যাপ্ত পরিমাণে তুরাঞ্জাবীন (বরফের মত স্বচ্ছ শুভ্র এক ধরনের মিষ্ট খাবার) উৎপন্ন হত আর তারা সেগুলো সংগ্রহ করে নিত। বাটের পাখী তাদের কাছে ঝাঁকে ঝাঁকে সমবেত হত; তাদের কাছ থেকে পালাত না। তারা সেগুলো ধরে জবাই করে খেত। যেহেতু তুরাঞ্জাবীনের অসাধারণ প্রাচুর্য এবং বাট পাখীর লোকভীতি না থাকাও ছিল অস্বাভাবিক। এ হিসাবে উভয় বস্তুই অদৃশ্য ধনভাণ্ডার হতে দেওয়া হয়েছিল বলে

প্রকাশ করা হয়েছে। তাদের যখন পানির প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল, তখন মূসা (আ)-কে লাঠি দিয়ে পাথরের ওপর আঘাত করতে নির্দেশ দেওয়া হল। আঘাতের সাথে সাথে পাথর থেকে ঝরনা প্রবাহিত হয়ে পড়ল। এ ব্যাপারে কোরআনের অন্য আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে। রাতের আঁধারের অভিযোগ করায় অদৃশ্যলোক হতে লোকালয়ের মাঝখানে ঝোলানোভাবে স্থায়ী আলোর ব্যবস্থা করা হল। আল্লাহ্ পাক অলৌকিক ক্ষমতাবলে এমন ব্যবস্থা করে দিলেন. যাতে তাদের পরিধেয় পোশাক না ছিঁড়ে এবং ময়লা না হয়। ছোট ছেলেমেয়েদের পোশাক, তাদের শরীর বৃদ্ধির সাথে সাথে সমানুপাতে বৃদ্ধি লাভ করতে থাকত। —(কুরতুবী)

তাদেরকে প্রদত্ত নেয়ামতরাজি প্রয়োজনানুপাতে ব্যয় করতে এবং ভবিষ্যতের জন্য মজুদ না রাখতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু লোভের বশবর্তী হয়ে তারা এরও বিরুদ্ধাচরণ করতে আরম্ভ করল। ফলে মজুতকৃত গোশত পচতে লাগল। আয়াতে একেই নিজের ক্ষতি বলে অভিহিত করা হয়েছে।

وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَّادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَّقُولُوا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطٰيٰكُمْ وَسَنَزِيْدُ الْمُحْسِنِيْنَ ۝٥٨

(৫৮) আর যখন আমি বললাম, তোমরা প্রবেশ কর এ নগরীতে এবং এতে যেখানে খুশী খেয়ে স্বাচ্ছন্দ্যে বিচরণ করতে থাক এবং দরজার ভিতর দিয়ে প্রবেশ করার সময় সেজদা করে ঢুক, আর বলতে থাক—'আমাদিগকে ক্ষমা করে দাও'—তাহলে আমি তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করব এবং সৎকর্মশীলদেরকে অতিরিক্ত দানও করব।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর (সে সময়ের কথা স্মরণ কর) যখন আমি তোমাদেরকে হুকুম করলাম যে, এ লোকালয়ে প্রবেশ কর, অতঃপর (এখানে প্রাপ্ত বস্তু-সামগ্রী) যেখানে চাও পরম তৃপ্তি সহকারে স্বাচ্ছন্দ্যে ভক্ষণ কর। (এবং এ হুকুমও দিলাম যে,) যখন ভেতরে প্রবেশ করতে আরম্ভ করবে, তখন দরজা দিয়ে (বিনয়ের সাথে) প্রণত মস্তকে প্রবেশ করবে এবং (মুখে) বলতে থাকবে, তওবা! (তওবা!) তাহলে তোমাদের পূর্বকৃত

যাবতীয় অপরাধ ক্ষমা করে দেব এবং (নিষ্ঠা) ও আন্তরিকতার সাথে সৎ কাজ সম্পন্নকারীদেরকে তার চাইতেও অধিক দান করব।

জ্ঞাতব্য ঃ শাহ আবদুল কাদের (র)-এর বক্তব্যানুসারে এ ঘটনাও তীহ্ উপত্যকায় বসবাসকালে সংঘটিত হয়েছিল। যখন বনী-ইসরাঈলের একটানা 'মান্না' ও 'সালওয়া' খেতে খেতে বিস্বাদ এসে গেল এবং স্বাভাবিক খাবারের জন্য প্রার্থনা করল (যেমন, পরবর্তী চতুর্থ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে) তখন তাদেরকে এমন এক নগরীতে প্রবেশ করতে হুকুম দেওয়া হল, যেখানে পানাহারের জন্য সাধারণভাবে ব্যবহার্য দ্রব্যাদি পাওয়া যাবে। সুতরাং এ হুকুমটি সে নগরীতে প্রবেশ করা সম্পর্কিত। এখানে নগরীতে প্রবেশকালে কর্মজনিত ও বাক্যজনিত দু'টি আদবের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। ('তওবা তওবা' বলে প্রবেশ করার মধ্যে বাক্যজনিত এবং প্রণত মস্তকে প্রবেশ করার মধ্যে কার্যজনিত আদব) এর প্রসঙ্গে বড়জোর এ কথা বলা যাবে যে, ঘটনার পরের অংশটি আগে এবং আগের অংশটি পরে বর্ণিত হয়েছে। এক্ষেত্রে জটিলতা তখনই হত, যখন কোরআন মজীদে ঘটনাই মুখ্য উদ্দেশ্য হত। কিন্তু যখন ফলাফল বর্ণনাই মূল লক্ষ্য তখন যদি একটি ঘটনার বিভিন্ন অংশের মধ্যে প্রতিটি অংশের ফলাফল ভিন্ন ভিন্ন হয় এবং ফলাফলগুলোর কোন প্রতিক্রিয়া ও প্রভাবের কথা বিবেচনা করে যদি আগের অংশকে পরে এবং পরের অংশকে আগে বর্ণনা করা হয়, তবে এতে কোন দোষের কারণ নেই এবং কোন আপত্তির কারণ থাকতে পারে না।

অন্যান্য তফসীরকারের মতে এ হুকুম ঐ নগরী সংক্রান্ত ছিল, যেখানে তাদেরকে জিহাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। তীহ্ উপত্যকায় তাদের অবস্থানকাল শেষ হওয়ার পর আবার সেখানে জিহাদ সংঘটিত হয়েছিল এবং সে নগরীর উপর তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সে সময় হযরত ইউশা (يوشع) (আ) নবী ছিলেন। সে নগরীতে জিহাদের হুকুমটি তাঁরই মাধ্যমে এসেছিল।

প্রথম অভিমত অনুসারে 'মান্না' ও 'সালওয়া' বর্জন করে সাধারণ খাবার সংক্রান্ত বনী-ইসরাঈলের আবেদনকেও পূর্ববর্তী অপরাধগুলোর অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া উচিত। তখন মর্ম দাঁড়াবে এই যে, আবেদনটি তো ধৃষ্টতাপূর্ণই ছিল, কিন্তু তবুও তারা যদি এ শিষ্টাচার (আদব) ও নির্দেশ পালন করে, তবে তাদেরকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে। এই উভয় অভিমত অনুযায়ী এ ক্ষমা সকল বক্তার জন্য সাধারণভাবে প্রযোজ্য হবেই। তদুপরি যারা নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতার সাথে সৎকার্যাবলী সম্পন্ন করবে, তাদের জন্য এছাড়াও অতিরিক্ত পুরস্কার থাকবে।

فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى
الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿٥٩﴾

(৫৯) অতঃপর জালেমরা কথা পাল্টে দিয়েছে যা কিছু তাদেরকে বলে দেওয়া হয়েছিল তা থেকে। তারপর আমি অবতীর্ণ করেছি জালেমদের উপর আযাব আসমান থেকে নির্দেশ লংঘন করার কারণে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

সুতরাং ঐ অত্যাচারীরা সে বাক্যটি আর একটি বাক্যাংশ দিয়ে পরিবর্তিত করে নিল, যা ঐ বাক্যাংশের বিপরীত ছিল—যা তাদেরকে (বলতে) নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। এর ফলে আমি ঐ অত্যাচারীদের উপর হুকুমের বিরুদ্ধাচরণের কারণে একটি আসমানী বিপদ নাযিল করলাম।

এ আয়াত পূর্ববর্তী আয়াতের পরিশিষ্ট। সে বিপরীত বাক্যাংশ এই ছিল যে, তারা حِطَّةٌ (তওবা, তওবা)-এর স্থলে পরিহাস করে حِنْطَةٌ যার অর্থে حَبَّةٌ فِي شَعِيرَةٌ (অর্থাৎ যবের মধ্যে শস্য) বলতে আরম্ভ করল। সে আসমানী বিপদটি প্লেগ রোগ, যা হাদীস অনুযায়ী অবাধ্যদের পক্ষে শাস্তি এবং অনুগতদের পক্ষে রহমতস্বরূপ। এ গর্হিত আচরণের শাস্তি হিসেবে তাদের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্লেগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিল এবং তাতে অগণিত লোকের মৃত্যু ঘটল। (কেউ কেউ মৃতের সংখ্যা সত্তর হাজার পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

বাক্যের শব্দগত পরিবর্তনের ক্ষেত্রে শরীয়তের বিধান ঃ এ আয়াত দ্বারা জানা গেল যে, বনী-ইসরাঈলকে উক্ত নগরীতে حِطَّةٌ বলতে বলতে প্রবেশ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। তারা দুষ্টামি করে সে শব্দের পরিবর্তে حِنْطَةٌ বলতে আরম্ভ করল। ফলে তাদের উপর আসমানী শাস্তি অবতীর্ণ হল। এই শব্দগত পরিবর্তন এমন ছিল—যাতে শুধু শব্দই পরিবর্তিত হয়ে যায়নি, বরং অর্থও সম্পূর্ণভাবে পাল্টে গিয়েছিল। حِطَّةٌ অর্থ তওবা ও পাপ বর্জন করা। আর حِنْطَةٌ অর্থ গম। এ ধরনের শব্দগত পরিবর্তন, তা কোরআনেই হোক বা হাদীসে কিংবা অন্য কোন খোদায়ী বিধানে নিঃসন্দেহে এবং সর্ববাদীসম্মতভাবে হারাম। কেননা এটা এক ধরনের تَحْرِيف তথা শব্দগত ও অর্থগত বিকৃতি সাধন।

বলা বাহুল্য, অর্থ ও উদ্দেশ্য পুরোপুরি রক্ষা করে নিছক শব্দগত পরিবর্তন সম্পর্কে কি হুকুম? ইমাম কুরতুবী এ সম্পর্কে মন্তব্য করেন যে, কোন বাক্যাংশে বা বক্তব্যে শব্দই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে এবং মর্ম ও ভাব প্রকাশের জন্য শব্দই অপরিহার্য বলে বিবেচিত হয়। এ ধরনের উক্তি ও বাণীর ক্ষেত্রে শব্দগত পরিবর্তনও জায়েয নয়। যেমন, আযানের জন্য নির্ধারিত শব্দের স্থলে সমার্থবোধক অন্য কোন শব্দ পাঠ করা জায়েয নয়। অনুরূপভাবে নামাযের মাঝে নির্দিষ্ট দোয়াসমূহ যেমন—সানা, আত্তাহিয়্যাতু, দোয়ায়ে কুনুত ও রুকু-সিজদার তসবীহসমূহ। এগুলোর অর্থ সম্পূর্ণভাবে ঠিক রেখেও কোন রকম শব্দগত পরিবর্তন জায়েয নয়। তেমনিভাবে সমগ্র কোরআন মজীদের শব্দাবলীরও একই হুকুম অর্থাৎ কোরআন তিলাওয়াতের সঙ্গে যেসব হুকুম সম্পর্কযুক্ত, তা শুধু ঐ শব্দাবলীতেই তিলাওয়াত করতে হবে, যাতে কোরআন নাযিল হয়েছে। যদি কোন ব্যক্তি এসব শব্দের অনুবাদ অন্য এমন সব শব্দের দ্বারা করে পাঠ করতে থাকে, যাতে অর্থ পুরোপুরিই ঠিক থাকে, তবে একে শরীয়তের পরিভাষায় কোরআন তিলাওয়াত বলা যাবে না। কোরআন পাঠ করার জন্য যে সওয়াব নির্দিষ্ট রয়েছে, তাও লাভ করতে পারবে না। কারণ কোরআন শুধু অর্থের নাম নয়, বরং অর্থের সাথে সাথে যে শব্দাবলীতে তা নাযিল হয়েছে, তার সমষ্টির নামই কোরআন।

فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ উল্লিখিত আয়াতের ভাষ্যে দৃশ্যত এ কথাই বোঝা যায় যে, তাদেরকে তওবার উদ্দেশ্যে যে শব্দটি বাত্‌লে দেওয়া হয়েছিল, তার উচ্চারণও করণীয় ছিল ; সেগুলোতে পরিবর্তন সাধন ছিল পাপ। আর তারা যে পরিবর্তন করেছিল তা ছিল অর্থেরও পরিপন্থী। কাজেই তারা আসমানী আযাবের সম্মুখীন হয়েছিল।

কিন্তু যে উক্তি ও বাক্যাংশে অর্থই মূল উদ্দেশ্য—শব্দ নয়, যদি সেগুলোতে শব্দগত এমন পরিবর্তন করা হয় যাতে অর্থের ক্ষেত্রে কোন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে না, তবে অধিকাংশ মুহাদ্দিসীন ও ফুকাহার মতে এ পরিবর্তন জায়েয। ইমাম মালেক, শাফেয়ী ও ইমাম আযম (র) থেকে ইমাম কুরতুবী উদ্ধৃত করেন যে, হাদীসের অর্থভিত্তিক বর্ণনা জায়েয আছে, কিন্তু শর্ত হচ্ছে এই যে, বর্ণনাকারীকে আরবী ভাষায় পারদর্শী হতে হবে এবং হাদীস বর্ণনার স্থান-কাল-পাত্র সম্পর্কে পুরোপুরি জ্ঞাত থাকতে হবে—যাতে তার ভুলের কারণে অর্থের ক্ষেত্রে কোন পার্থক্য সৃষ্টি না হয়।

মুহাম্মদ ইবনে সিরীন (র), কাসেম ইবনে মুহাম্মদ (র) প্রমুখ একদল হাদীস বিশেষজ্ঞের মতে হাদীসের শব্দাবলী যে রকম শুনেছেন অবিকল সে রকম বর্ণনা করাই আবশ্যক। এদের প্রমাণ সে হাদীস যে, একদিন হুযুরে পাক (সা) জনৈক সাহাবীকে শিক্ষা দিচ্ছিলেন যে, বিছানায় ঘুমোতে যাওয়ার সময়

اٰمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِىْ اَنْزَلْتَ وَنَبِيِّكَ الَّذِىْ اَرْسَلْتَ

(আল্লাহ্, আপনি যে কিতাব নাযিল করেছেন তার উপর ঈমান এনেছি এবং যে নবী পাঠিয়েছেন, তাঁর উপর ঈমান এনেছি।) এ দোয়া পাঠ করবে। সে সাহাবী نبيك-এর স্থলে رسولك পড়লেন। তখন হুযুর (সা) এই হেদায়েত করলেন যে, نبيك ই পড়বে। এতে বোঝা গেল যে, শব্দগত পরিবর্তনও জায়েয নয়।

অনুরূপভাবে অন্য এক হাদীসে হুযুর (সা) এরশাদ করেন ঃ

نضر الله امرأ سمع مقالتى فبلغها كما سمعها ـ

(আল্লাহ্ পাক ঐ ব্যক্তিকে সদা হাসিমুখ ও আনন্দোজ্জ্বল রাখুন, যে আমার কোন বাণী শুনেছে এবং যেমন শুনেছে অবিকল তেমনই অপরের নিকট পৌঁছিয়েছে।) এটা সুস্পষ্ট যে, হাদীস যে শব্দে শোনা হয় ঠিক সে শব্দে পৌঁছানোকেই 'হাদীস বর্ণনা' বলা হয়।

কিন্তু অধিকাংশ মুহাদ্দিস ও ফকীহ্র মতে হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে যে শব্দে শুনেছে ইচ্ছাকৃতভাবে এতে কোন পরিবর্তন না করে অবিকল সে শব্দে নকল করা যদিও উত্তম—কিন্তু যদি সে শব্দাবলী পুরোপুরি স্মরণ না থাকে, তবে তার মর্ম ও ভাবার্থ নিজস্ব শব্দে ব্যক্ত করাও জায়েয। হাদীস بلغها كما سمعها অর্থ এও হতে পারে, 'যে বিষয় শুনেছে অবিকল সে বিষয়ই পৌঁছিয়ে দেয়'। শব্দগত পরিবর্তন এর পরিপন্থী নয়। এ মতের সমর্থনে ইমাম কুরতুবী বলেছেন, প্রয়োজনানুসারে শব্দগত পরিবর্তন যে জায়েয—স্বয়ং এ হাদীসই এর প্রমাণ। কারণ এ হাদীসের রেওয়ায়েত আমাদের নিকট পর্যন্ত বিভিন্ন শব্দে পৌঁছেছে।

পূর্ববর্তী হাদীসে যে হুযুর نبيك এর স্থলে رسولك পড়তে বারণ করেছেন, তার এক কারণ এও হতে পারে যে, نبى শব্দে رسول শব্দের চাইতে প্রশংসা বেশী। কেননা 'দূত' অর্থে رسول শব্দের ব্যবহার অন্যদের ক্ষেত্রেও হতে পারে। অপর পক্ষে نبى শব্দ শুধু সে পদ-মর্যাদার ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়, যা স্বয়ং আল্লাহ্ পাকের পক্ষ হতে ওহীর মাধ্যমে তাঁর বিশেষ বান্দাদেরকে দান করা হয়েছে।

দ্বিতীয় কারণ এও হতে পারে যে, দোয়ার ক্ষেত্রে বর্ণিত শব্দাবলীর অনুসরণ, বৈশিষ্ট্য ও প্রতিক্রিয়ার দিক দিয়ে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ; অন্যান্য শব্দে সে বৈশিষ্ট্য অনুপস্থিত। এজন্য আলেম মনীষিগণ যাঁরা তাবীজ-তুমার লিখে থাকেন, তাঁরা এর প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন এবং বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখেন, যাতে বর্ণিত শব্দাবলীর কোন পরিবর্তন-পরিবর্ধন না হয়।

এ পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, দোয়ায়ে-মাসূরাসমূহ ও কোরআন-হাদীসে বর্ণিত অন্যান্য দোয়া এই প্রথম শ্রেণীভুক্ত—যাতে অর্থের সাথে সাথে শব্দের সংরক্ষণও উদ্দেশ্য।

وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ ۖ
فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ۖ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ۖ
كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٦٠﴾

(৬০) আর মূসা যখন নিজ জাতির জন্য পানি চাইল, তখন আমি বললাম, স্বীয় যষ্টির দ্বারা আঘাত কর পাথরের উপরে। অতঃপর তা থেকে প্রবাহিত হয়ে এল বারটি প্রস্রবণ। তাদের সব গোত্রই চিনে নিল নিজ নিজ ঘাট। আল্লাহ্‌র দেয়া রিযিক খাও, পান কর আর দুনিয়ার বুকে দাঙ্গা-হাঙ্গামা করে বেড়িও না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর (সে সময়টির কথা স্মরণ কর,) যখন হযরত মূসা (আ) নিজ সম্প্রদায়ের জন্য পানির দোয়া করেছিলেন। তারই প্রেক্ষিতে আমি (মূসা-কে) হুকুম করলাম যে, (অমুক) পাথরের ওপর লাঠি দ্বারা আঘাত কর (তাহলেই তা থেকে পানি নিঃসৃত হয়ে আসবে)। বস্তুত (লাঠির আঘাতের সাথে সাথে) তৎক্ষণাৎ বারটি প্রস্রবণ ফুঁড়ে বেরিয়ে পড়ল আর (বনী-ইসরাঈলরা যেহেতু বারটি গোত্রে বিভক্ত ছিল কাজেই প্রত্যেকে) নিজ নিজ পানি পান করার স্থান চিনে নিল এবং আমি এ উপদেশ দিলাম যে, (খাবার জিনিস) খাও এবং (পান করার জিনিস) পান কর আল্লাহ্ প্রদত্ত আহার্য (পরিমিত) এবং সীমালংঘন করে দুনিয়ার বুকে অশান্তি ও কলহ সৃষ্টি করো না।

জ্ঞাতব্য ঃ এ ঘটনাটিও তীহ্ প্রান্তরেই ঘটেছিল। সেখানে তৃষ্ণা পেলে পর তারা পানি চাইল। হযরত মূসা (আ)-র দোয়ার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্ পাকের অপার মহিমায় নিছক একটি লাঠির আঘাতে একটি নির্দিষ্ট পাথর থেকে বারটি প্রস্রবণ প্রবাহিত হয়ে পড়ল। ইহুদীদের বারটি গোত্র নিম্নরূপ ছিল—হযরত ইয়াকুব (আ)-এর বার পুত্র ছিলেন। প্রত্যেকের সন্তান-সন্ততিরই একেকটি গোত্র বা বংশ ছিল এবং সামাজিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে প্রত্যেককে পৃথক পৃথক রাখা হতো। সব গোত্রের

দলপতিও ছিল ভিন্ন ভিন্ন। এজন্য প্রস্রবণও বারটি বের হলো। এখানে 'খাও' অর্থ মান্না ও সালওয়া খাওয়া এবং 'পান কর' শব্দে প্রস্রবণের পানি পান করাই বোঝানো হয়েছে।

এ ধরনের অলৌকিক ঘটনাবলী অস্বীকার করা নিতান্তই ভ্রান্তিমূলক ব্যাপার। যখন আল্লাহ্ পাক কোন কোন পাথরের মধ্যে কল্পনাতীত ও সাধারণ বুদ্ধি বিবেক-বহির্ভূতভাবে এমন গুণও রেখেছেন, যা লোহাকে আকর্ষণ করতে পারে, তখন পাথরের মধ্যস্থিত ভূমির অংশ থেকে পানি আকর্ষণের গুণ সৃষ্টি করে তা থেকে প্রস্রবণ প্রবাহিত করা তাঁর পক্ষে মোটেও অসম্ভব নয়।

এ বর্ণনার দ্বারা বর্তমান কালের প্রজ্ঞাবান ও বিদগ্ধ মহলের শিক্ষা গ্রহণ করা ও উপকৃত হওয়া উচিত। আবার এ দৃষ্টান্তও নিছক স্থূলবুদ্ধি লোকদের জন্য নতুবা পাথরের অংশগুলো থেকেও যদি পানি বের হয়, তাইবা কেন অসম্ভব হবে? যেসব বিজ্ঞজন এ ধরনের ঘটনা অসম্ভব বলে মন করেন, তাঁরা প্রকৃতপক্ষে অসম্ভবের মর্মই অনুধাবন করতে পারেন নি।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

উল্লিখিত আয়াতে বলা হয়েছে যে, হযরত মূসা (আ) নিজ সম্প্রদায়ের প্রয়োজনে পানির জন্য দোয়া করলে আল্লাহ্ পাক পানির ব্যবস্থা করে দিলেন। পাথরের উপর লাঠির আঘাতের সাথে সাথে প্রস্রবণ প্রবাহিত হয়ে পড়ল। এতে বোঝা গেল যে, এস্তেস্কা (পানির জন্য প্রার্থনা)-এর মূল হল দোয়া। মূসা (আ)-র শরীয়তেও বিষয়টিকে শুধু দোয়াতেই সীমিত রাখা হয়েছে। যেমন, ইমাম আযম আবু হানীফা (র) বলেন যে, এস্তেসকার মূল হলো পানির জন্য দোয়া করা। এ দোয়া কোন কোন সময়ে এস্তেস্কার নামাযের আকারেও করা হয়েছে। যেমন, এস্তেস্কার নামাযের উদ্দেশে হুযুর (সা)-এর ঈদগাহে তশরীফ নেওয়া এবং সেখানে নামায, খুতবা ও দোয়া করার কথা বিশুদ্ধ হাদীসে বর্ণিত রয়েছে। আবার কখনও নামায বাদ দিয়ে শুধু বাহ্যিক অর্থে দোয়া করেই ক্ষান্ত করেছেন। যেমন, বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে যে, হুযুর (সা) জুমার খুতবায় পানির জন্য দোয়া করেন---ফলে আল্লাহ্ পাক বৃষ্টি বর্ষণ করেন।

একথা সর্ববাদীসম্মত যে, এস্তেস্কা নামাযের আকারে হোক বা দোয়ার রূপে হোক, তা ক্রিয়াশীল ও গুরুত্ববহ হওয়ার জন্য পাপ থেকে তওবা নিজের দীনতা হীনতা ও দাসত্বসুলভ আচরণের অভিব্যক্তি একান্ত আবশ্যক। পাপে অটল এবং আল্লাহ্র অবাধ্যতায় অনড় থেকে দোয়া করলে তা ক্রিয়াশীল হবে বলে আশা করার অধিকার কারো নেই।

وَإِذْ قُلْتُمْ يٰمُوسٰى لَنْ نَّصْبِرَ عَلٰى طَعَامٍ وَّاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ
يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْۢبِتُ الْاَرْضُ مِنْۢ بَقْلِهَا وَقِثَّآئِهَا وَفُوْمِهَا
وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا ۭ قَالَ اَتَسْتَبْدِلُوْنَ الَّذِىْ هُوَ اَدْنٰى بِالَّذِىْ هُوَ
خَيْرٌ ۭ اِهْبِطُوْا مِصْرًا فَاِنَّ لَكُمْ مَّا سَاَلْتُمْ ۭ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ
الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ ۤ وَبَآءُوْ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ ۭ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ
كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِيّٖنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۭ
ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ۝٦١ ع

(৬১) আর তোমরা যখন বললে, হে মূসা, আমরা একই ধরনের খাদ্যদ্রব্যে কখনও ধৈর্য ধারণ করব না। কাজেই তুমি তোমার পালনকর্তার নিকট আমাদের জন্য প্রার্থনা কর, তিনি যেন আমাদের জন্য এমন বস্তুসামগ্রী দান করেন, যা জমিতে উৎপন্ন হয়, তরকারী, কাঁকড়ী, গম, মসুরী, পেঁয়াজ প্রভৃতি। মূসা (আ) বললেন, তোমরা কি এমন বস্তু নিতে চাও যা নিকৃষ্ট সে বস্তুর পরিবর্তে যা উত্তম? তোমরা কোন নগরীতে উপনীত হও, তাহলেই পাবে যা তোমরা কামনা করছ। আর তাদের উপর আরোপ করা হলো লাঞ্ছনা ও পরমুখাপেক্ষিতা। তারা আল্লাহ্‌র রোষানলে পতিত হয়ে ঘুরতে থাকল। এমন হলো এজন্য যে, তারা আল্লাহ্‌র বিধি-বিধান মানত না এবং নবীদের অন্যায়ভাবে হত্যা করত। তার কারণ, তারা ছিল নাফরমান, সীমা-লংঘনকারী।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর (সে সময়টির কথা স্মরণ কর,) যখন তোমরা (এরূপ) বললে, হে মূসা! (প্রতি দিন) একই খাবার (অর্থাৎ মান্না-সালওয়া) আমরা কখনো খেতে থাকব না। আপনি আপনার পালনকর্তার নিকট দোয়া করুন, যেন তিনি এমন বস্তু (খাবার হিসাবে) সৃষ্টি করে দেন, যা ভূমি থেকে উৎপন্ন হয়—শাক-সব্জি, কাঁক্‌ড়ী, গম, মসুরের ডাল,

পেয়াজ-রসুন প্রভৃতি (যাই হোক না কেন)। তিনি (অর্থাৎ আল্লাহ্) বললেন, তোমরা কি উৎকৃষ্ট বস্তু-সামগ্রী বদলিয়ে নিকৃষ্ট জিনিস গ্রহণ করতে চাও ? (বেশ যদি না-ই মান) তবে কোন নগরীতে (গিয়ে) অবতরণ কর, (সেখানে) নিশ্চয়ই তোমরা এসব জিনিস পাবে যার জন্য আবেদন করছ। এবং (এ ধরনের পর্যায়ক্রমিক ধৃষ্টতার দরুন এককালে) তাদের লাঞ্ছনা-গঞ্জনা (ক্ষতচিহ্নের মত) স্থায়ী হলো। (অর্থাৎ অপরের দৃষ্টিতে তাদের কোন মর্যাদাই রইল না।) এবং (তাদের দীনতা ও হীনতা) (অর্থাৎ তাদের স্বভাব-প্রকৃতিতে উচ্চাশা ও মহৎ সংকল্প গুণ বিদ্যমান রইল না)। বস্তুত তারা আল্লাহ্র রোষ ও গযবের যোগ্য হয়ে পড়ল। আর এ (লাঞ্ছনা ও রোষ) এজন্য (হলো) যে, তারা আল্লাহ্র বিধি-বিধানের প্রতি কুফরী করেছিল এবং নবীদের হত্যা করেছিল। এ হত্যা তাদের দৃষ্টিতেও ছিল অন্যায়। এ (লাঞ্ছনা ও রোষ) এ কারণেও হল যে, তারা আনুগত্য প্রকাশ করত না এবং আনুগত্যের সীমালংঘন করে যাচ্ছিল।

জ্ঞাতব্য ঃ এ ঘটনাও তীহ্ উপত্যকাসংশ্লিষ্ট ঘটনাই। মান্না ও সালওয়ার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়েই তারা ওসব সব্জি ও শস্যের জন্য আবেদন করল। এ প্রান্তরের সীমান্ত-বর্তী এলাকায় একটি শহর ছিল। সেখানে গিয়ে চাষাবাদ করে উৎপন্ন ফসলাদি ভোগ করার নির্দেশ দেওয়া হলো।

তাদের লাঞ্ছনা-গঞ্জনার মধ্যে এটাও একটা যে, কিয়ামত পর্যন্ত সময়ের জন্য ইহুদীদের থেকে রাজ্য ছিনিয়ে নেওয়া হলো। অবশ্য কিয়ামতের অব্যবহিত পূর্বে সর্বমোট চল্লিশ দিনের জন্য নিছক লুটেরা দলের ন্যায় অনিয়মিত ও আইন শৃংখলা বিবর্জিত ইহুদী দাজ্জালের কিঞ্চিৎ ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। একে কোন বুদ্ধিমান ও বিবেকবানই রাজ্য বলতে পারবে না। আল্লাহ্ পাক হযরত মূসা (আ)-র মাধ্যমে পূর্বেই তাদেরকে সাবধান করে দিয়েছিলেন যে, যদি নির্দেশ অমান্য কর, তবে চিরকাল তোমরা অন্য জাতির দ্বারা শাসিত হতে থাকবে। যেমন সূরা আ'রাফে বলা হয়েছে ঃ

وَاِذْ تَاَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَنْ يَّسُوْمُهُمْ سُوْٓءَ الْعَذَابِ -

এবং সে সময়টি স্মরণ করুন, যখন আপনার পালনকর্তা জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, নিশ্চয় তিনি ইহুদীদের উপর কিয়ামত পর্যন্ত এমন শাসক প্রেরণ (নিয়োগ) করতে থাকবেন, যারা তাদের প্রতি কঠিন শাস্তি পৌঁছাতে থাকবে।

বস্তুত বর্তমান ইসরাঈল রাষ্ট্রের মর্যাদাও আমেরিকা ও বৃটেনের গোলাম বৈ আর কিছু নয়।

তা ছাড়াও বহু নবী বিভিন্ন সময়ে ইহুদীদের হাতে নিহত হয়েছেন—যা নিতান্ত অন্যায় বলে তারা নিজেরাও মনে মনে উপলব্ধি করত, কিন্তু প্রতিহিংসা ও হঠকারিতা তাদেরকে অন্ধ করে রেখেছিল।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ইহুদীদের চিরস্থায়ী লাঞ্ছনার অর্থ, বর্তমান ইসরাঈল রাষ্ট্রের ফলে উদ্ভূত সন্দেহ ও তার উত্তর ঃ উল্লিখিত আয়াতসমূহে ইহুদীদের শাস্তি, ইহকালে চিরস্থায়ী লাঞ্ছনা-গঞ্জনা এবং ইহকাল ও পরকালে খোদায়ী গযব ও রোষের বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে। বিশিষ্ট তফসীরকারগণ, সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীনের বর্ণনানুসারে ওদের স্থায়ী লাঞ্ছনা-গঞ্জনার প্রকৃত অর্থ, কোরআনের প্রখ্যাত ভাষ্যকর ইবনে কাসীরের ভাষায় ঃ

لا يزالون مستذليين من وجدهم استذلهم وضرب عليهم الصغار

অর্থাৎ তারা যত ধন-সম্পদের অধিকারীই হোক না কেন, বিশ্ব-সম্প্রদায়ের মাঝে তুচ্ছ ও নগণ্য বলে বিবেচিত হবে। যার সংস্পর্শে আসবে সে-ই তাদেরকে অপমানিত করবে এবং তাদেরকে দাসত্বের শৃঙ্খলে জড়িয়ে রাখবে।

বিশিষ্ট তফসীরকার ইমাম যাহ্হাকের ভাষায় এ লাঞ্ছনা-অবমাননার অর্থ ঃ هم اهل القبالات يعنى الجزية অর্থাৎ ইহুদীগণ সর্বদা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ-ভাবে অপরের দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকবে।

একই মর্মে সূরা 'আলে-ইমরানের' এক আয়াতে রয়েছে ঃ

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ ○

অর্থাৎ আল্লাহ্প্রদত্ত ও মানবপ্রদত্ত মাধ্যম ব্যতীত তারা যেখানে যাবে সেখানেই তাদের জন্য লাঞ্ছনা ও অবমাননা পুঞ্জীভূত হয়ে থাকবে। আল্লাহ্প্রদত্ত ও মানবপ্রদত্ত মাধ্যমের অর্থ এই যে, যাদেরকে আল্লাহ্ পাক নিজের বিধান অনুসারে আশ্রয় ও অভয় দিয়েছেন। যেমন, অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালকগণ বা রমণীকুল বা এমন সাধক ও উপাসক যে মুসলমানদের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় না, তারা নিরাপদ আশ্রয়ে থাকবে। আর মানবপ্রদত্ত মাধ্যম অর্থ শান্তিচুক্তি যার একটি রূপ এও হতে পারে যে, মুসলমানদের সাথে শান্তিচুক্তির মাধ্যমে বা অমুসলিম সংখ্যালঘু হিসাবে জিযিয়া কর

প্রদানের প্রতিশ্রুতিতে তাদের দেশে বসবাসের সুযোগ লাভ করবে। কিন্তু কোরআনের আয়াতে مِنَ النَّاسِ বলা হয়েছে مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ বলা হয়নি। সুতরাং এমন হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে যে, অন্য অমুসলিমদের সাথে শান্তিচুক্তির মাধ্যমে তাদের আশ্রয়াধীন হয়ে সাময়িক শান্তিতে বসবাস করতে পারে।

সারকথা, ইহুদীগণ উপরিউক্ত দু'অবস্থা ব্যতীত সর্বত্র ও সর্বদাই লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবে। (১) আল্লাহ্প্রদত্ত ও অনুমোদিত আশ্রয়ের মাধ্যমে, যার ফলে তাদের অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান-সন্ততি, নারী প্রভৃতি এই লাঞ্ছনা ও অবমাননা থেকে অব্যাহতি পাবে। (২) কিংবা শান্তিচুক্তির মাধ্যমে নিজেদেরকে এ অবমাননা থেকে মুক্ত রাখতে পারে। এ চুক্তি মুসলমানদের সাথেও হতে পারে কিংবা অন্যান্য অমুসলিম জাতির সাথেও শান্তিচুক্তি সম্পাদন করে তাদের আশ্রয়াধীন হয়ে তাদের সাহায্যে এ গঞ্জনা ও অবমাননা থেকে রক্ষা পেতে পারে।

এমনিভাবে সূরা 'আলে-ইমরানে'র আয়াত দ্বারা সূরা বাক্কারাহ্ আয়াতের বিশদ বিশ্লেষণ হয়ে গেল। অধুনা ফিলিস্তীনে ইসরাঈল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ফলে মুসলমানদের মধ্যে যে সন্দেহের অবতারণা হয়েছে, এ দ্বারা তাও দূরীভূত হয়ে যায়। তা এই যে, কোরআনের আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, ইহুদীদের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা কখনও সম্ভব হবে না। অথচ বাস্তবে দেখা যায়, ফিলিস্তীনে তাদের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে। উত্তর সুস্পষ্ট—কেননা ফিলিস্তীনে ইহুদীদের বর্তমান রাষ্ট্রের গূঢ় তত্ত্ব সম্পর্কে যারা সম্যক্ অবগত, তারা ভালভাবেই জানেন যে, এ রাষ্ট্র প্রকৃত প্রস্তাবে ইসরাঈলের নয়, বরং আমেরিকা ও বৃটেনের এক ঘাঁটি ছাড়া অন্য কিছু নয়। এ রাষ্ট্র নিজস্ব সম্পদ ও শক্তির উপর নির্ভর করে এক মাসও টিকে থাকতে পারবে কিনা সন্দেহ। পাশ্চাত্যের খৃস্টান শক্তি ইসলামী বিশ্বকে দুর্বল করার উদ্দেশ্যে তাদের মাঝখানে ইসরাঈল নাম দিয়ে একটি সামরিক ঘাঁটি প্রতিষ্ঠা করেছে। এ রাষ্ট্র আমেরিকা-ইউরোপীয়দের দৃষ্টিতে একটা অনুগত ও আজ্ঞাবহ ষড়যন্ত্র কেন্দ্র ছাড়া অন্য কোন গুরুত্ব বহন করে না। এ যেন কোরআনের বাণী بِحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ এরই বাস্তব রূপ। পাশ্চাত্য শক্তিবলয়, বিশেষ করে আমেরিকার সাথে নানা ধরনের প্রকাশ্যে ও গোপন চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে তাদের পক্ষপুষ্ট ও আশ্রিত হয়ে নিছক ক্রীড়নকরূপে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে। তাও অত্যন্ত লাঞ্ছনা ও অবমাননার ভিতর দিয়ে। সুতরাং বর্তমান ইসরাঈল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দরুন কোরআনের কোন আয়াত সম্পর্কে সামান্যতম সন্দেহেরও অবকাশ সৃষ্টি হতে পারে না। এছাড়া এক্ষেত্রে আরও একটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য যে, ইহুদী, খৃস্টান ও মুসলমানদের মধ্যে ইহুদীরাই সর্বপ্রাচীন জাতি। তাদের ধর্ম, তাদের সভ্যতা ও কৃষ্টি সর্বাপেক্ষা পুরাতন। সারা বিশ্বে ফিলিস্তীনের এক ক্ষুদ্র ভূ-ভাগে কোন প্রকারে তাদের অধিকার যদি প্রতিষ্ঠিত হয়েও থাকে, তবু এটা বিশাল বিশ্ব-মানচিত্রে

একটি ক্ষুদ্র বিন্দুর চাইতে অধিক মর্যাদার দাবী রাখে না। অপরপক্ষে খৃস্টান রাষ্ট্রসমূহ মুসলমানদের পতন-যুগ সত্ত্বেও তাদের রাষ্ট্রসমূহ এবং অন্যান্য পৌত্তলিক ও বিধর্মীদের রাষ্ট্রসমূহ যা বিশ্বের বিভিন্ন ভূখণ্ডে পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত বিস্তৃত, সে তুলনায় ফিলিস্তীন এবং তাও আবার অর্ধাংশ—তদুপরি আমেরিকা ও বৃটেনের পক্ষপুষ্ট এবং আশ্রয়াধীন, এরূপভাবে যদি সেখানে ইসরাঈলদের কোন অধিকার ও শাসনক্ষমতা প্রতিষ্ঠা হয়েও যায়, তবে এদ্বারা গোটা ইহুদী সম্প্রদায়ের উপর আল্লাহ্ পাকের পক্ষ হতে আরোপিত চিরস্থায়ী লাঞ্ছনার অবসান হয়েছে এরূপ ভাবতে পারা যায় কি?

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَىٰ وَالصَّابِئِينَ
مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ
عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٢﴾

(৬২) নিঃসন্দেহে যারা মুসলমান হয়েছে এবং যারা ইহুদী, নাসারা ও সাবেঈন, (তাদের মধ্য থেকে) যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ্র প্রতি ও কিয়ামত দিবসের প্রতি এবং সৎকাজ করেছে, তাদের জন্য রয়েছে তার সওয়াব তাদের পালনকর্তার কাছে। আর তাদের কোনই ভয়ভীতি নেই, তারা দুঃখিতও হবে না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(এখানে ইহুদীদের গর্হিত আচরণ ও অনাচারের কথা জেনে শ্রোতাদের অথবা স্বয়ং ইহুদীদের এ ধারণা হতে পারে যে, এমতাবস্থায় যদি ক্ষমা প্রার্থনা করে ঈমান আনতেও চায়, তবে হয়ত আল্লাহ্ পাকের নিকট তা গ্রহণযোগ্য হবে না। এ ধারণা অপনোদনের জন্য এ আয়াতে আল্লাহ্ পাক একটি সাধারণ নীতিমালা বর্ণনা করেছেন। সে নীতি এই,) মুসলমান, ইহুদী, খৃস্টান এবং সাবেঈন সম্প্রদায়-এর মধ্যে যারা আল্লাহ্ তা'আলার (সত্তা ও গুণাবলীর) প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং কিয়ামতের উপর এবং (শরীয়তী বিধান অনুসারে) সৎকাজ করে, এমন লোকের জন্য তাদের পালনকর্তার নিকটে (পৌঁছে) তাদের প্রতিদানও রয়েছে। এবং (সেখানে পৌঁছে) তাদের কোন আশংকা থাকবে না এবং তারা সন্তাপগ্রস্তও হবে না।

জ্ঞাতব্য ঃ নীতি বা আইনের মর্ম সুস্পষ্ট। আল্লাহ্ পাক বলেছেন যে, আমার দরবারে কোন ব্যক্তির বিশেষ মর্যাদা নেই। যে ব্যক্তি বিশ্বাস ও কর্মে পুরোপুরি

আনুগত্য স্বীকার করবে, সে পূর্বে যেমনই থাকুক না কেন, সে আমার নিকট গ্রহণযোগ্য এবং তার আমল পছন্দনীয় ও প্রশংসনীয়। আর এটা সুস্পষ্ট যে, কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার পর 'পূর্ণ আনুগত্য' মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে মুসলমান হওয়াতে সীমাবদ্ধ। যার অর্থ এই যে, যে মুসলমান হবে. সে-ই পরকালে নাজাতের অধিকারী হবে। এখানে পূর্ববর্তী ধারণার উত্তর হয়ে গেল। অর্থাৎ এতসব অনাচার ও গর্হিত আচরণের পরেও যদি মুসলমান হয়ে যায়, তবে আমি সব মাফ করে দেব।

আরবে সাবেঈন নামে একটি বিশেষ সম্প্রদায় ছিল, তাদের ধর্ম-বিশ্বাস ও কার্য-প্রণালী সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না বলে তাদের সম্পর্কে বিভিন্ন মত রয়েছে। বস্তুত আলোচ্য এ আইনে বাহ্যত মুসলমানদের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। কেননা তারা তো মুসলমান আছেই। কিন্তু এতে বাক্যের সৌন্দর্য বৃদ্ধি হয়েছে এবং প্রতিপাদ্য বিষয়ের গুরুত্ব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে। এর উদাহরণ এই যে, কোন শাসক বা সম্রাট কোন বিধান প্রয়োগকালে যদি এরূপ ঘোষণা করেন যে, আমার বিধান সাধারণ ও ব্যাপক—সকলের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য, স্বপক্ষীয়-বিপক্ষীয় শত্রু-মিত্র যে-ই এর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করবে সে-ই অনুকম্পার পাত্র হবে। একথা সুস্পষ্ট যে, যারা স্বপক্ষীয় মিত্র তারা তো আনুগত্য প্রদর্শন করেই চলেছে—আসলে যারা বিরোধী ও শত্রু তাদেরকেই ঘোষণাটি শোনানোর উদ্দেশ্য। কিন্তু এর নিগূঢ় তত্ত্ব এই যে, অনুগত ও মিত্রদের প্রতি আমার যে অনুকম্পা, তার কারণ কোন ব্যক্তিবিশেষ নয় বা ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যও নয়; বরং তার মিত্রতা ও বশ্যতাগুণের উপরই আমার অনুকম্পা বা অনুগ্রহ নির্ভরশীল। সুতরাং বিরোধী শত্রুও যদি এ বশ্যতা গ্রহণ করে নেয়, তাহলে সেও স্বপক্ষীয় মিত্রের সমপর্যায়ভুক্ত হয়ে সমপরিমাণ অনুকম্পা ও অনুগ্রহ লাভ করবে। সে জন্যেই পূর্বোক্ত আইনে বিরোধী শত্রুর সাথে স্বপক্ষীয় মিত্রেরও উল্লেখ করা হয়েছে।

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا
آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٦٣﴾

(৬৩) আর আমি যখন তোমাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম এবং তূর পর্বতকে তোমাদের মাথার উপর তুলে ধরেছিলাম এই বলে যে, তোমাদিগকে যে কিতাব দেওয়া হয়েছে তাকে ধর সুদৃঢ়ভাবে এবং এতে যা কিছু রয়েছে তা মনে রেখো, যাতে তোমরা ভয় কর।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর ঐ সময়টির কথা স্মরণ কর, যখন আমি তোমাদের থেকে এ অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম (যে, তোমরা তওরাতের উপর আমল করবে।) এবং (এ অঙ্গীকার

গ্রহণ করার জন্য) আমি তূর পর্বতকে উঠিয়ে (সমান্তরালে) ঝুলিয়ে দিলাম এবং (সে সময়ে বললাম,) যে কিতাব আমি তোমাদেরকে প্রদান করেছি (অর্থাৎ, তওরাত) তা (সত্বর) দৃঢ়তার সাথে গ্রহণ কর। এবং এতে (কিতাবে) যে নির্দেশাবলী রয়েছে, তা স্মরণ রেখো, যাতে (আশা করা যায় যে,) তোমরা মুত্তাকী হতে পারবে।

জ্ঞাতব্য ঃ যখন হযরত মূসা (আ)-কে তূর পর্বতে তওরাত প্রদান করা হলো, তখন তিনি ফিরে এসে তা বনী-ইসরাঈলকে দেখাতে ও শোনাতে আরম্ভ করলেন। এতে হুকুমগুলো কিছুটা কঠোর ছিল—কিন্তু তাদের অবস্থানুযায়ীই ছিল। এ সম্পর্কে প্রথম তারা একথাই বলেছিল যে, যখন স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে বলে দেবেন যে, 'এটা আমার কিতাব' তখনই আমরা মেনে নেব। (যে বর্ণনা উপরে চলে গেছে) মোটকথা, যে সত্তর জন লোক মূসা (আ)-র সাথে গিয়েছিল, তারা ফিরে এসে সাক্ষী দিল। কিন্তু তাদের সাক্ষ্যের সাথে এ কথাটিও নিজেদের পক্ষ হতে সংযুক্ত করে দিল যে, আল্লাহ্ তা'আলা সর্বশেষে একথাও বলে দিয়েছেন, "তোমরা যতটুকু পার আমল কর, আর যা না পার তা আমি ক্ষমা করে দেব।" এটা কতকটা তাদের স্বভাবগত দুরন্তপনা ও হঠকারিতার পরিচয়। হুকুমগুলো কিছুটা কঠিন হওয়াতে বরং উপরিউক্ত বাক্যটি সংযুক্ত হওয়াতে তাদের এক সুবর্ণ সুযোগ হয়ে গেল। তারা পরিষ্কারভাবে বলে দিল, আমাদের দ্বারা এ গ্রন্থের উপর আমল করা সম্ভব হবে না। ফলে আল্লাহ্ পাক ফেরেশতাদেরকে হুকুম করলেন, 'তূর পর্বতের একটি অংশ উঠিয়ে তাদের মাথার উপরে ঝুলিয়ে রেখে দাও এবং বল, হয় কিতাব মেনে নাও, নইলে এক্ষুনি মাথার উপর পড়ল!' অবশেষে নিরুপায় হয়ে তাদের তা মেনে নিতে হলো।

একটি সন্দেহের অপনোদন ঃ এখানে এ সন্দেহ হতে পারে যে, ধর্মে যদি কোন জোর-জবরদস্তি বা বাধ্যবাধকতা না থাকবে, তবে এক্ষেত্রে কেন এমন করা হলো? উত্তর এই যে, জবরদস্তি ঈমান গ্রহণ করার জন্য নয়; বরং স্বেচ্ছায়-সানন্দে ইসলাম গ্রহণ করার পর এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার কারণে। প্রত্যেক রাষ্ট্রে বিদ্রোহীদের শাস্তি, সাধারণ দুষ্কৃতকারী ও অপরাধী থেকে সম্পূর্ণ পৃথক হয়। প্রত্যেক রাষ্ট্রে তাদের জন্য দু'টি পথই থাকে—হয় আনুগত্য স্বীকার, না হয় প্রাণদণ্ড। এজন্য শরীয়ত অনুযায়ী ইসলাম পরিত্যাগকারীর শাস্তি প্রাণদণ্ড। কিন্তু কুফরীর (ধর্ম গ্রহণ না করার) শাস্তি মৃত্যুদণ্ড নয়।

ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِّنْ بَعْدِ ذٰلِكَ ۚ فَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ
لَكُنْتُمْ مِّنَ الْخٰسِرِيْنَ ۝

(৬৪) তারপরেও তোমরা তা থেকে ফিরে গেছ। কাজেই আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও মেহেরবানী যদি তোমাদের উপর না থাকত তবে অবশ্যই তোমরা ধ্বংস হয়ে যেতে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

অতঃপর তোমরা (সেই প্রতিজ্ঞা করার পর) তা থেকে ফিরে গেছ। অতএব, তোমাদের প্রতি যদি আল্লাহ্‌র করুণা ও মেহেরবানী না হতো, তবে (তোমাদের সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের তাগিদ অনুসারে) নিশ্চয়ই তোমরা (সঙ্গে সঙ্গে) ধ্বংস (ও বিধ্বস্ত) হয়ে যেতে। (কিন্তু এ আমার একান্ত অনুগ্রহ ও দয়া যে, তোমাদের জন্য নির্ধারিত জীবন-কাল শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়ের অবকাশ দিয়ে রেখেছি। অবশ্য মৃত্যুর পর কৃতকর্মের প্রতিফল তোমাদের ভোগ করতে হবে।

জ্ঞাতব্য ঃ আল্লাহ্‌র সাধারণ রহমত পৃথিবীতে বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী, মুমিন-কাফের নির্বিশেষে সবার জন্যই ব্যাপক। তারই প্রভাব হলো পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও শারীরিক সুস্থতা। তবে বিশেষ রহমতের বিকাশ ঘটবে আখেরাতে, যার ফলে মুক্তি ও আল্লাহ্‌র নৈকট্যলাভ সম্ভব হবে।

বাহ্যিক দৃষ্টিতে আয়াতের শেষাংশের লক্ষ্য হলো সে সমস্ত ইহুদী, যারা মহানবী (সা)-র সময়ে উপস্থিত ছিল। হুযুর আকরাম (সা)-এর ওপর ঈমান না আনাও যেহেতু উল্লেখিত প্রতিজ্ঞা ভঙ্গেরই অন্তর্ভুক্ত, সেহেতু তারাও পূর্বোক্ত প্রতিজ্ঞা ভঙ্গকারীদের আওতাভুক্ত হয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা হয়েছে যে, এতদসত্ত্বেও আমি দুনিয়াতে তোমাদের উপর তেমন কোন আযাব অবতীর্ণ করিনি, যেমনটি পূর্বকালে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গকারীদের উপর অবতীর্ণ হয়ে থাকত। এটা একান্তই আল্লাহ্‌র রহমত।

আর হাদীসের বর্ণনার ভিত্তিতে আযাব অবতীর্ণ না হওয়াটা যেহেতু মহানবী (সা)-রই বরকত, কাজেই কোন কোন তফসীরকার মহানবী (সা)-র আবির্ভাবকেই আল্লাহ্‌র রহমত ও করুণা বলে বিশ্লেষণ করেছেন।

এ বিষয়টির সমর্থনকল্পে বিগত বেঈমানদের একটি ঘটনা পরবর্তী আয়াতে বিবৃত হচ্ছে ঃ

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِيْنَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُوْنُوْا قِرَدَةً خٰسِئِيْنَ ﴿٦٥﴾ فَجَعَلْنٰهَا نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿٦٦﴾

(৬৫) তোমরা তাদেরকে ভালরূপে জেনেছ, যারা শনিবারের ব্যাপারে সীমালংঘন করেছিল। আমি বলেছিলাম ঃ তোমরা লাঞ্ছিত বানর হয়ে যাও। (৬৬) অতঃপর আমি এ ঘটনাকে তাদের সমসাময়িক ও পরবর্তীদের জন্য দৃষ্টান্ত এবং আল্লাহ্ ভীরুদের জন্য উপদেশ গ্রহণের উপাদান করে দিয়েছি।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর তোমরা সে সম্প্রদায়ের অবস্থা সম্পর্কে অবগত রয়েছ, তোমাদের মধ্য থেকে যারা শনিবারের সম্পর্কিত নির্দেশ অমান্য করে শরীয়তের সীমা লঙ্ঘন করেছিল। (তাদের জন্য শনিবারে মৎস্য শিকার নিষিদ্ধ ছিল)। অতঃপর আমি তাদের (আদি ও অলঙ্ঘনীয় নির্দেশের মাধ্যমে বিকৃত করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে) বলে দিলাম ঃ তোমরা লাঞ্ছিত বানর হয়ে যাও (সেমতে তারা বানরের আকৃতিতে রূপান্তরিত হয়ে গেল)। অতঃপর আমি একে একটি নিদর্শনমূলক ঘটনা করে দিলাম তাদের সমসাময়িকদের এবং পরবর্তীদের জন্য। আর (এ ঘটনাকে) উপদেশপ্রদ (করে দিলাম) আল্লাহ্ ভীরুদের জন্য।

জ্ঞাতব্য ঃ বনী-ইসরাঈলের এ ঘটনাটিও হযরত দাউদ (আ)-এর আমলে সংঘটিত হয়। বনী-ইসরাঈলের জন্য শনিবার ছিল পবিত্র এবং সাপ্তাহিক উপাসনার জন্য নির্দিষ্ট। এ দিন মৎস্য শিকার করা নিষিদ্ধ ছিল। তারা সমুদ্রোপকূলের অধিবাসী ছিল বলে মৎস্য শিকার ছিল তাদের প্রিয় কাজ। ফলে নিষেধাজ্ঞা অমান্য করেই তারা মৎস্য শিকার করে। এতে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে 'মস্‌খ' তথা আকৃতি রূপান্তরের শাস্তি নেমে আসে। তিনদিন পর এদের সবাই মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

এ ঘটনার দর্শক ও শ্রোতা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। অবাধ্য শ্রেণী ও অনুগত শ্রেণী। অবাধ্যদের জন্য এ ঘটনাটি ছিল অবাধ্যতা থেকে তওবা করার উপকরণ। এ কারণে একে نَكَالٌ এ (শিক্ষাপ্রদ দৃষ্টান্ত) বলা হয়েছে। অপরদিকে অনুগতদের জন্য এটা

ছিল আনুগত্যে অটল থাকার কারণ। এ জন্য একে مَوْعِظَةٌ (উপদেশপ্রদ) ঘটনা বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ধর্মীয় কাজে এমন কলাকৌশল অবলম্বন করা হারাম, যাতে শরীয়তের নির্দেশ বাতিল হয়ে যায়ঃ বিভিন্ন রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, এ আয়াতে বনী-ইসরাঈলের যে শাস্তিযোগ্য সীমালঙ্ঘনের কথা বলা হয়েছে, তা শরীয়তের নির্দেশের পরিষ্কার বিরোধী ছিল না, বরং সেটা ছিল এমন এক অপকৌশল, যাতে শরীয়তের নির্দেশ আপনা থেকেই বাতিল হয়ে যায়। উদাহরণত শনিবার দিন মাছের লেজে লম্বা সূতা বেঁধে দেওয়া এবং তার একটা মাথা ডাঙায় কোন কিছুর সাথে বেঁধে রাখা এবং রবিবার আসতেই সূতা টেনে মাছ শিকার করে নেওয়া। বলা বাহুল্য, এ অপ-কৌশলের মাধ্যমে শরীয়তের বিধান লঙ্ঘিত হয়ে যায়, বরং এটা এক রকম উপহাসও বটে। এহেন অপকৌশলের আশ্রয় গ্রহণকারীদের উদ্ধত নাফরমান সাব্যস্ত করা হয়েছে এবং তাদের উপর শাস্তি নেমে এসেছে।

কিন্তু এ দ্বারা প্রমাণিত হয় না যে, ঐসব কলাকৌশলও হারাম যা স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলে দিয়েছেন। উদাহরণত একসের উৎকৃষ্ট খেজুরের বিনিময়ে দুই সের নিকৃষ্ট খেজুর ক্রয় করা সূদের অন্তর্ভুক্ত। এ সূদ থেকে বাঁচার জন্য স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম একটি কৌশল বলে দিয়েছেন। তা হচ্ছে বস্তুর বিনিময়ে বস্তু না দিয়ে তার মূল্য দ্বারা ক্রয়-বিক্রয় করা। উদাহরণত দুই সের নিকৃষ্ট খেজুর দুই দিরহামের বিনিময়ে বিক্রয় কর। অতঃপর দুই দিরহাম দ্বারা একসের উৎকৃষ্ট খেজুর কিনে নাও। এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয় শরীয়তের নির্দেশে বাতিল হয় না এবং তা উদ্দেশ্যও নয়; বরং নির্দেশ পালন করাই লক্ষ্য। এমনি ধরনের আরও কতিপয় মাস'আলায় ফিকাহ্‌বিদগণ হারাম থেকে আত্মরক্ষার জন্য বৈধ পন্থা উদ্ভাবন করেছেন। সেগুলোকে বনী-ইসরাঈলদের কলাকৌশলের অনুরূপ বলা বা মনে করা নিতান্ত ভুল।

আকৃতি রূপান্তরের ঘটনাঃ তফসীরে কুরতুবীতে বলা হয়েছে, ইহুদীরা প্রথম প্রথম কলা-কৌশলের অন্তরালে এবং পরে সাধারণ পদ্ধতিতে ব্যাপকভাবে মৎস্য শিকার করতে থাকে। এতে তারা দুই দলে বিভক্ত হয়ে যায়। একদল ছিল সৎ ও বিজ্ঞ লোকদের। তারা এ অপকর্মে বাধা দিলেন। কিন্তু প্রতিপক্ষ বিরত হলো না। অবশেষে তারা এদের সাথে যাবতীয় সম্পর্ক ছিন্ন করে পৃথক হয়ে গেলেন। এমনকি বাসস্থানও দুই ভাগে ভাগ করে নিলেন। একভাগে অবাধ্যরা বসবাস করত আর অপর ভাগে সৎ

ও বিজ্ঞ জনেরা বাস করতেন। একদিন তারা অবাধ্যদের বস্তিতে অস্বাভাবিক নীরবতা লক্ষ্য করলেন। অতঃপর সেখানে পৌঁছে দেখলেন যে, সবাই বানরে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। হযরত কাতাদাহ্ (রা) বলেন, তাদের যুবকরা বানরে এবং বৃদ্ধরা শূকরে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। রূপান্তরিত বানররা নিজ নিজ আত্মীয়-স্বজনকে চিনত এবং তাদের কাছে এসে অঝোরে অশ্রু বিসর্জন করত।

রূপান্তরিত সম্প্রদায়ের বিলুপ্তি ঃ এ সম্পর্কে স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম একটি অভ্রান্ত উক্তি করেছেন। সহীহ্ মুসলিমে আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) কর্তৃক বর্ণিত আছে যে, কয়েকজন সাহাবী একবার রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ হুযুর! আমাদের যুগের বানর ও শূকরগুলোও কি সেই রূপান্তরিত ইহুদী সম্প্রদায়? তিনি বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা যখন কোন সম্প্রদায়ের ওপর আকৃতি রূপান্তরের আযাব নাযিল করেন, তখন তারা ধরাপৃষ্ঠ থেকে বিলুপ্ত হয়ে যায়। তিনি আরও বললেন, বানর ও শূকর পৃথিবীতে পূর্বেও ছিল, ভবিষ্যতেও থাকবে। এদের সাথে রূপান্তরিত বানর ও শূকরদের সম্পর্ক নেই।

এ প্রসঙ্গে কোন কোন টীকাকার সহীহ্ বুখারীর বরাত দিয়ে বানরদের মধ্যে ব্যভিচারের অপরাধে প্রস্তর বর্ষণে হত্যা করার একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। কিন্তু ঘটনাটি বুখারীর কোন নির্ভরযোগ্য সংকলনে নেই। রেওয়ায়েতের নীতি অনুযায়ীও তা অভ্রান্ত নয়।—(কুরতুবী)

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً ۖ قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا ۖ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿٦٧﴾

(৬৭) যখন মূসা (আ) স্বীয় সম্প্রদায়কে বললেন ঃ আল্লাহ্ তোমাদের একটি গরু জবাই করতে বলেছেন। তারা বলল, তুমি কি আমাদের সাথে উপহাস করছ? মূসা (আ) বললেন, মূর্খদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে আমি আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(স্মরণ কর,) যখন (হযরত) মূসা (আ) স্বীয় সম্প্রদায়কে বললেন, আল্লাহ্ তোমাদের নির্দেশ দেন যে, (যদি ঐ মৃতদেহের হত্যাকারীর সন্ধান পেতে চাও, তবে)

একটি গরু জবাই কর। তারা বলতে লাগল ঃ তুমি কি আমাদের সাথে উপহাস করছ? (কোথায় হত্যাকারীর সন্ধান, আর কোথায় গরু জবাই করা!) মূসা (আ) বললেন, (নাউযুবিল্লাহ!) আমি কি আল্লাহর নির্দেশ নিয়ে ঠাট্টা করার মত মূর্খ জনোচিত কাজ করতে পারি?

জ্ঞাতব্য ঃ ঘটনার বিবরণ এই যে, বনী-ইসরাঈলদের মধ্যে একটি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল। মিশকাতের টীকা গ্রন্থ মিরকাতের বর্ণনা অনুযায়ী এর কারণ ছিল বিবাহজনিত। জনৈক ব্যক্তি নিহত ব্যক্তির কন্যার পাণিগ্রহণ করার প্রস্তাব করলে প্রত্যাখাত হয় এবং প্রস্তাবক কন্যার পিতাকে হত্যা করে গা-ঢাকা দেয়। ফলে হত্যাকারী কে, তা জানা কঠিন হয়ে পড়ে।

মাআলী (রা) কাল্‌বী (রা)-র বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, তখন পর্যন্তও তওরাতে হত্যা সম্পর্কে কোন আইন বিদ্যমান ছিল না। এতে বোঝা যায়, ঘটনাটি তওরাত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বেকার।

মোটকথা, বনী-ইসরাঈল মূসা (আ)-র কাছে হত্যাকারীকে খুঁজে বের করার ইচ্ছা ব্যক্ত করলে তিনি আল্লাহ্‌র নির্দেশ অনুযায়ী তাদের একটি গরু জবাই করার জন্য আদেশ দেন। তারা চিরাচরিত অভ্যাস ও প্রকৃতি অনুযায়ী এতে নানা প্রকার বাদানুবাদের অবতারণা করতে থাকে।

পরবর্তী আয়াতসমূহে এ বাদানুবাদেরই বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَا هِيَ ۚ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا
بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ ۖ عَوَانٌ بَيْنَ ذَٰلِكَ ۖ فَافْعَلُوا مَا
تُؤْمَرُونَ ﴿٦٨﴾ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَا لَوْنُهَا ۚ قَالَ
إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ
النَّاظِرِينَ ﴿٦٩﴾ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ
تَشَابَهَ عَلَيْنَا ۚ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ ﴿٧٠﴾ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ

إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ
لَّا شِيَةَ فِيهَا ۚ قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ ۚ فَذَبَحُوهَا وَمَا
كَادُوا يَفْعَلُونَ ﴿٧١﴾

(৬৮) তারা বলল, তুমি তোমার পালনকর্তার কাছে আমাদের জন্য প্রার্থনা কর, যেন সেটির রূপ বিশ্লেষণ করা হয়। মূসা (আ) বললেন, তিনি বলেছেন সেটা হবে একটা গাভী, যা বৃদ্ধ নয় এবং কুমারীও নয়—বার্ধক্য ও যৌবনের মাঝামাঝি বয়সের। এখন আদিষ্ট কাজ করে ফেল। (৬৯) তারা বলল, তোমার পালনকর্তার কাছে আমাদের জন্য প্রার্থনা কর যে, তার রং কিরূপ হবে? মূসা (আ) বললেন, তিনি বলেছেন যে, গাঢ় পীতবর্ণের গাভী—যা দর্শকদের আনন্দ দান করে। (৭০) তারা বলল, তোমার প্রভুর কাছে প্রার্থনা কর—তিনি বলে দিন যে, সেটা কিরূপ? কেননা, গরু আমাদের কাছে সাদৃশ্যশীল মনে হয়। ইনশাআল্লাহ্ এবার আমরা অবশ্যই পথ প্রাপ্ত হব। (৭১) মূসা (আ) বললেন, 'তিনি বলেন যে, এ গাভী ভূকর্ষণ ও পানি সেচের শ্রমে অভ্যস্ত নয়—হবে নিষ্কলঙ্ক, নিখুঁত।' তারা বলল, এবার সঠিক তথ্য এনেছ। অতঃপর তারা সেটা জবাই করল, অথচ জবাই করবে বলে মনে হচ্ছিল না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

তারা বলতে লাগল ঃ আপনি স্বীয় প্রভুর কাছে আমাদের জন্যে প্রার্থনা করুন। তিনি যেন বলে দেন যে, গরুটির গুণাবলী কি হবে? মূসা (আ) বললেন, প্রভু (আমাদের প্রার্থনার প্রত্যুত্তরে) বলেন যে, গরুটি না বৃদ্ধ হবে, না শাবক; বরং উভয় বয়সের মাঝামাঝি। সুতরাং এখন (বেশী বাদানুবাদ না করে) যা আদেশ করা হয়েছে, তা করে ফেল। তারা বলতে লাগল (আরও একটি) প্রার্থনা করুন যে, ওর রং কিরূপ হবে, তিনি (যেন তাও) বলে দেন। মূসা (আ) বললেন, (এ সম্পর্কে) আল্লাহ্ বলেন যে, গরুটি হবে পীত বর্ণের। এর রং এত গাঢ় হবে যে, দর্শকরা আনন্দে অভিভূত হয়ে পড়বে। তারা বলতে লাগল ঃ (এবার) আমাদের জন্যে আরো একটা প্রার্থনা করুন যে, তিনি প্রথমবারের প্রশ্নের উত্তর আরও স্পষ্ট করে বলে দিন যে, ওর কি গুণাবলী হবে? কেননা, গরু সম্পর্কে আমাদের মনে (কিছু) সন্দেহ আছে (যে, এটা সাধারণ গরু, না অত্যাশ্চর্য ধরনের—যাতে হত্যাকারী অনুসন্ধানের বিশেষ কোন চিহ্ন থাকবে)।

ইনশাআল্লাহ আমরা অবশ্যই (এবার) ঠিক ঠিক বুঝে নেব। মূসা (আ) বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন যে, এটা কোন অত্যাশ্চর্য গরু নয়; বরং সাধারণ গরুই হবে। তবে উৎকৃষ্ট হওয়া চাই। উল্লিখিত গুণাবলীসহ একে এমনও হতে হবে যে, একে হালচাষে জোড়া হয়নি এবং (কুয়ায় জুড়ে) শস্যক্ষেত্রে সেচের কাজও করা হয়নি (মোট কথা) যাবতীয় দোষমুক্ত সুস্থকায় এবং এতে (কোন প্রকার) খুঁত যেন না থাকে। (একথা শুনে) তারা বলতে লাগল, (হাঁ) এবার আপনি পূর্ণ (এবং পরিষ্কার) কথা বলেছেন। (অবশেষে তারা গরু খুঁজে কিনে আনল) অতঃপর তারা তাকে জবাই করল। কিন্তু (বাহ্যিক অবস্থা দৃষ্টে) জবাই করবে বলে মনে হচ্ছিল না।

হাদীসে বর্ণিত আছে, বনী-ইসরাঈল এসব বাদানুবাদে প্রবৃত্ত না হলে এতসব শর্তও আরোপিত হত না; বরং যে কোন গরু জবাই করে দিলেই যথেষ্ট হত।

وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا ۖ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنتُمْ
تَكْتُمُونَ ﴿٧٢﴾ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا ۚ كَذَٰلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ ۙ
وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٧٣﴾

(৭২) যখন তোমরা একজনকে হত্যা করে পরে সে সম্পর্কে একে অপরকে অভিযুক্ত করেছিলে। যা তোমরা গোপন করছিলে, তা প্রকাশ করে দেওয়া ছিল আল্লাহ্র অভিপ্রায়। (৭৩) অতঃপর আমি বললাম ঃ গরুর একটি খণ্ড দ্বারা মৃতকে আঘাত কর। এইভাবে আল্লাহ্ মৃতকে জীবিত করেন এবং তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শনসমূহ প্রদর্শন করেন—যাতে তোমরা চিন্তা-ভাবনা কর।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(স্মরণ কর) যখন তোমাদের একজন অন্যজনকে হত্যা করল, অতঃপর (নিজের সাফাইয়ের উদ্দেশ্যে অন্যের উপর দোষারোপ করতে লাগল। (তখন আল্লাহ্র কাজ-ছিল তা প্রকাশ করে দেওয়া.) যা (তোমাদের) অপরাধী ও দোষী লোকেরা গোপন করেছিল। এ কারণে (গরু জবাই করার পর) আমি নির্দেশ দিলাম যে, মৃতদেহকে গরুর কোন টুকরা ছুঁইয়ে দাও। (সেমতে ছুঁইয়ে দিতেই মৃত ব্যক্তি জীবিত হয়ে উঠল। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা এ ঘটনাকে কিয়ামতের অস্বীকারকারীদের সামনে প্রমাণ হিসাবে উপস্থিত করে বলেন যে,) এভাবেই আল্লাহ্ (কিয়ামতের দিন) মৃতদের জীবিত

করবেন। আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় (কুদরতের) নিদর্শনাবলী তোমাদের প্রদর্শন করেন এ আশায় যে, তোমরা চিন্তা-ভাবনাকে কাজে লাগাবে এবং এক নিদর্শনকে দেখে অপর নিদর্শনকে অস্বীকার করা থেকে বিরত থাকবে।

মৃতদেহকে গরুর টুকরা স্পর্শ করাতেই সে জীবিত হয়ে যায় এবং হত্যাকারীর নাম বলে তৎক্ষণাৎ আবার মরে যায়।

এক্ষেত্রে নিহত ব্যক্তির বর্ণনাকেই যথেষ্ট মনে করা হয়েছে। কারণ, মূসা (আ) ওহীর মাধ্যমে জানতে পেরেছিলেন যে, নিহত ব্যক্তি সত্য বলবে। নতুবা শরীয়তসম্মত সাক্ষী-প্রমাণ ছাড়া নিহত ব্যক্তির জবানবন্দীই হত্যা প্রমাণের জন্য যথেষ্ট হতে পারে না।

এক্ষেত্রে এরূপ সন্দেহ করাও ঠিক নয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা এমনিতেই মৃতকে জীবিত করতে সক্ষম ছিলেন, অথবা নিহত ব্যক্তিকে জীবিত না করেও হত্যাকারীর নাম প্রকাশ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল। এমতাবস্থায় এতসব আয়োজনের কি প্রয়োজন ছিল? উত্তর এই যে, আল্লাহ্ তা'আলার প্রত্যেক কাজ প্রয়োজন অথবা বাধ্যতার ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হয় না; বরং উপযোগিতা ও বিশেষ তাৎপর্যের ভিত্তিতে হয়ে থাকে। প্রত্যেক ঘটনার প্রকৃত তাৎপর্য একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন। ঘটনার উপযোগিতা জানার জন্য আমরা আদিষ্টও নই এবং প্রতিটি রহস্য আমাদের হৃদয়ঙ্গম হওয়া অপরিহার্যও নয়। এ কারণে এর পেছনে পড়ে জীবন বরবাদ করার চাইতে মেনে নেওয়া অথবা মৌনতা অবলম্বন করাই উত্তম।

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ
أَشَدُّ قَسْوَةً ۚ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ ۚ
وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ ۚ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا
يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٧٤﴾

(৭৪) অতঃপর এ ঘটনার পরে তোমাদের অন্তর কঠিন হয়ে গেছে। তা পাথরের মত অথবা তদপেক্ষাও কঠিন। পাথরের মধ্যে এমনও আছে; যা থেকে ঝরনা প্রবাহিত হয়, এমনও আছে, যা বিদীর্ণ হয়, অতঃপর তা থেকে পানি নির্গত হয় এবং এমনও

আছে, যা আল্লাহ্‌র ভয়ে খসে পড়তে থাকে। আল্লাহ্ তোমাদের কাজকর্ম সম্পর্কে বেখবর নন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(বিগত ঘটনাবলীতে প্রভাবিত না হওয়ার দরুন অভিযোগের ভঙ্গিতে বলা হচ্ছে ঃ) এমন ঘটনার পর (তোমাদের অন্তর একেবারে নরম ও আল্লাহ্‌র মহত্ত্বে আপ্লুত হয়ে যাওয়াই সঙ্গত ছিল; কিন্তু) তোমাদের অন্তরই কঠিন রয়ে গেছে। এখন (বলা যায় যে,) তা পাথরের মত অথবা (বলা যায় যে, কঠোরতায়) পাথর অপেক্ষাও বেশী। (পাথর থেকেও অধিক কঠিন হওয়ার কারণ এই যে,) কোন কোন পাথর তো এমনও রয়েছে যা থেকে বড় বড় নদ-নদী প্রবাহিত হয়। আবার কোন কোন পাথর বিদীর্ণ হয়ে যায়। অতঃপর তা থেকে (বেশী না হলেও অল্প) পানি নির্গত হয়। এ ছাড়া কোন পাথর আল্লাহ্‌র ভয়ে উপর থেকে নীচে গড়িয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে তোমাদের অন্তরে কোন প্রকার প্রভাবই পরিলক্ষিত হয় না। (এহেন কঠিন অন্তর থেকে যেসব মন্দ কাজকর্ম প্রকাশ পায়,) তোমাদের (সেসব) কাজকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বেখবর নন (তিনি সত্বরই তোমাদের সমুচিত শাস্তি দেবেন)।

জ্ঞাতব্য ঃ এখানে পাথরের তিনটি ক্রিয়া বর্ণিত হয়েছে ঃ (১) পাথর থেকে বেশী পানি প্রসরণ (২) কম পানির নিঃসরণ। এ দুটি প্রভাব সবারই জানা। (৩) আল্লাহ্‌র ভয়ে নীচে গড়িয়ে পড়া। এ তৃতীয় ক্রিয়াটি কারও কারও অজানা থাকতে পারে। কারণ, পাথরের কোনরূপ জ্ঞান ও অনুভূতি নেই। কিন্তু জানা উচিত যে, ভয় করার জন্য জ্ঞানের প্রয়োজন নেই। জন্তু-জানোয়ারের জ্ঞান নেই, কিন্তু আমরা তাদের মধ্যে ভয়-ভীতি প্রত্যক্ষ করি। তবে চেতনার প্রয়োজনও অবশ্য আছে। জড় পদার্থের মধ্যে এতটুকু চেতনাও নেই বলে কেউ প্রমাণ দিতে পারবে না। কারণ চেতনা প্রাণের উপর নির্ভরশীল। খুব সম্ভব জড় পদার্থের মধ্যে এমন সূক্ষ্ম প্রাণ আছে যা আমরা অনুভব করতে পারি না। উদাহরণত বহু পণ্ডিত মস্তিষ্কের চেতনাশক্তি অনুভব করতে পারেন না। তারা একমাত্র যুক্তির ভিত্তিতেই এর প্রবক্তা। সুতরাং ধারণাপ্রসূত প্রমাণাদির চাইতে কোরআনী আয়াতের যৌক্তিকতা কোন অংশে কম নয়।

এ ছাড়া আমরা এরূপ দাবীও করি না যে, পাথর সব সময় ভয়ের দরুনই নীচে গড়িয়ে পড়ে। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা 'কতক পাথর' বলেছেন। সুতরাং নীচে গড়িয়ে পড়ার অন্য আরও বিভিন্ন কারণ থাকতে পারে। তন্মধ্যে একটি হল আল্লাহ্‌র ভয়। আর অন্যগুলো প্রাকৃতিক হতে পারে।

এখানে তিন রকমের পাথরের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও সাবলীল ভঙ্গিতে এদের শ্রেণীবিন্যাস ও উদ্দেশ্য ব্যক্ত করা হয়েছে। কতক পাথরের প্রভাবান্বিত হওয়ার ক্ষমতা এত প্রবল যে, তা থেকে নদী-নালা প্রবাহিত হয়ে যায় এবং তদ্বারা সৃষ্ট জীবের উপকার সাধিত হয়। কিন্তু ইহুদীদের অন্তর এমন নয় যে, সৃষ্ট জীবের দুঃখ-দুর্দশায় অশ্রুসজল হবে। কতক পাথরের মধ্যে প্রভাবান্বিত হওয়ার ক্ষমতা কম। ফলে সেগুলোর দ্বারা উপকারও কম হয়। এ ধরনের পাথর প্রথম ধরনের পাথরের তুলনায় কম নরম হয়। কিন্তু ইহুদীদের অন্তর এ দ্বিতীয় ধরনের পাথর থেকেও বেশী শক্ত।

কতক পাথরের মধ্যে উপরোক্ত রূপ প্রভাব না থাকলেও এতটুকু প্রভাব অবশ্যই আছে যে, আল্লাহ্‌র ভয়ে নীচে গড়িয়ে পড়ে। এ পাথর উপরোক্ত দুই প্রকার পাথরের তুলনায় অধিক দুর্বল। কিন্তু ইহুদীদের অন্তর দুর্বলতম প্রভাব থেকেও মুক্ত।

أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٧٥﴾

(৭৫) (হে মুসলমানগণ)! তোমরা কি আশা কর যে, তারা তোমাদের কথায় ঈমান আনবে? তাদের মধ্যে একদল ছিল, যারা আল্লাহ্‌র বাণী শ্রবণ করত। অতঃপর বুঝে-শুনে তা পরিবর্তন করে দিত এবং তারা তা অবগত ছিল।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(মুসলমানেরা ইহুদীদের ঈমানদার করার চেষ্টায় অনেক কষ্ট স্বীকার করত। আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াতের মাধ্যমে ইহুদীদের অবস্থা ও ঘটনাবলী বলে ও শুনিয়ে মুসলমানদের আশার অবসান ঘটাচ্ছেন এবং তাদের কষ্ট দূর করছেন।

হে মুসলমানগণ, (এসব কাহিনী শুনে) এখনও কি তোমরা আশা কর যে, ইহুদীরা তোমাদের কথায় ঈমান আনবে? (অথচ তাদের দ্বারা উপরোক্ত ঘটনাবলী ছাড়া আরও একটি জঘন্য ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। তা এই যে, তাদের একদল লোক (অতীতে) আল্লাহ্‌র বাণী শুনে তা বিকৃত করে দিত, তা হৃদয়ঙ্গম করার পর

(এমন করত)। এবং (মজার ব্যাপার এই যে,) তারা জানত (যে তারা জঘন্য অপরাধ করেছে; শুধু ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্যই তারা এমনটি করত)।

জ্ঞাতব্য ঃ উদ্দেশ্য এই যে, যারা এমন ধৃষ্টতাপূর্ণ ও স্বার্থান্বেষী, তারা অন্যের সদুপদেশে কখনও মন্দ কাজ থেকে বিরত হবে না।

এখানে 'আল্লাহ্র বাণী' অর্থাৎ তওরাত। 'শ্রবণ কর' অর্থাৎ পয়গম্বরদের মাধ্যমে শ্রবণ কর। 'পরিবর্তন করা' অর্থাৎ, কোন কোন বাক্য অথবা ব্যাখ্যা অথবা উভয়টিকে বিকৃত করে ফেলা।

অথবা 'আল্লাহর বাণী' অর্থাৎ ঐ বাণী, যা মূসা (আ)-র সত্যায়নের উদ্দেশে তাঁর সাথে গমনকারী সত্তর জন ইহুদী তুর পর্বতে শুনেছিল। 'শ্রবণ' অর্থ মাধ্যমবিহীন-ভাবে সরাসরি শ্রবণ। 'পরিবর্তন' অর্থ স্বগোত্রের কাছে প্রসঙ্গক্রমে এরূপ বর্ণনা করা যে, আল্লাহ্ তা'আলা উপসংহারে বলে দিয়েছেন ঃ তোমরা যেসব নির্দেশ পালন করতে না পার, তা মাফ।

হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর আমলে যেসব ইহুদী ছিল, তাদের দ্বারা উল্লিখিত কোন কুকর্ম সংঘটিত হয়নি সত্য; কিন্তু পূর্ববর্তীদের এসব দুষ্কর্মকে তারা অপছন্দ ও ঘৃণা করত না। এ কারণে তারাও কার্যত পূর্ববর্তীদের মতই।

وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا ۖ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ
بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ
بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٧٦﴾

(৭৬) যখন তারা মুসলমানদের সাথে মিলিত হয়, তখন বলে ঃ আমরা মুসলমান হয়েছি। আর যখন পরস্পরের সাথে নিভৃতে অবস্থান করে, তখন বলে ঃ পালনকর্তা তোমাদের জন্য যা প্রকাশ করেছেন, তা কি তাদের কাছে বলে দিচ্ছ? তাহলে যে তারা এ নিয়ে পালনকর্তার সামনে তোমাদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে। তোমরা কি তা উপলব্ধি কর না?

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যখন তারা (অর্থাৎ কপট ইহুদীরা) মুসলমানদের সাথে মিলিত হয়, তখন (তাদের) বলে ঃ আমরা (এই মাত্র) ঈমান এনেছি। আর যখন নিভৃতে যায়, কতক (কপট ইহুদী) অন্য কতকের (অর্থাৎ প্রকাশ্য ইহুদীর) সাথে (তখন তাদের সহচর ও সহধর্মী হওয়ার দাবী করে) তখন তারা (প্রকাশ্য ইহুদীরা) বলে ঃ তোমরা (একি সর্বনাশা কাজ কর যে, মুসলমানদের তোষামোদ করতে গিয়ে তাদের ধর্মের পক্ষে উপকারী কথাবার্তা) বলে দাও, যা আল্লাহ্ তা'আলা তওরাতে তোমাদের জন্য প্রকাশ করেছেন? (কিন্তু বিশেষ উদ্দেশ্যে আমরা তা গোপন রাখি।) এর ফল হবে এই যে, তারা বাদানুবাদে তোমাদের (একথা বলে) হারিয়ে দেবে (যে, দেখ এ বিষয়টি আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের ধর্মগ্রন্থেও বর্ণিত রয়েছে)। তোমরা কি (এ স্থূল বিষয়টিও) উপলব্ধি কর না?

মুনাফিক ইহুদীরা তোষামোদের ছলে নিজেদের ঈমানের সত্যতা প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে মাঝে মাঝে কিছু গোপন কথা বলে দিত। উদাহরণত, তওরাতে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের আগমনের সুসংবাদ বর্ণিত হয়েছে, কোরআন মজীদ সম্পর্কে সংবাদ উল্লিখিত হয়েছে ইত্যাদি। এ কারণে অন্যরা তাদের তিরস্কার করত।

أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٧٧﴾
وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا
يَظُنُّونَ ﴿٧٨﴾ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ
يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۖ فَوَيْلٌ لَّهُم
مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ ﴿٧٩﴾

(৭৭) তারা কি এতটুকুও জানে না যে, আল্লাহ্ সেসব বিষয়ও পরিজ্ঞাত যা তারা গোপন করে এবং যা প্রকাশ করে। (৭৮) তোমাদের কিছু লোক নিরক্ষর। তারা মিথ্যা আকাঙ্ক্ষা ছাড়া আল্লাহ্র গ্রন্থের কিছুই জানে না। তাদের কাছে কল্পনা ছাড়া কিছুই নেই। (৭৯) অতএব তাদের জন্য আফসোস, যারা নিজ হাতে গ্রন্থ লেখে এবং বলে, এটা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ—যাতে এর বিনিময়ে সামান্য অর্থ গ্রহণ করতে পারে অতএব তাদের প্রতি আক্ষেপ তাদের হাতের লেখার জন্য এবং তাদের প্রতি আক্ষেপ তাদের উপার্জনের জন্য।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

তাদের কি একথা জানা নেই যে, আল্লাহ্ সে সবই জানেন—যা তারা গোপন করে এবং যা তারা প্রকাশ করে। (কাজেই মুসলমানদের কাছে মুনাফিকদের কুফরী বিষয় গোপন করে এবং হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সুসংবাদ সম্পর্কিত বিষয় গোপন করে কোন লাভ নেই। আল্লাহ্ তা'আলা সবই জানেন। সেমতে তিনি উভয় বিষয়ই মুসলমানদের বলে দিয়েছেন।)

এ আয়াতে শিক্ষিত ইহুদীদের কথা বর্ণিত হয়েছে। পরবর্তী আয়াতে অশিক্ষিতদের কথা এভাবে বলা হয়েছে ঃ

তাদের মধ্যে অনেক অশিক্ষিতও রয়েছে। এরা খোদায়ী গ্রন্থের জ্ঞান রাখে না; কিন্তু (ভিত্তিহীন) আকর্ষণীয় কথাবার্তা বেশ ভাল করেই মনে করে রেখেছে। তারা আর কিছু নয়, শুধু অলীক কল্পনার জাল বোনে। (এর কারণ, কিছুটা তাদের আলেমদের অসম্পূর্ণ শিক্ষা, আর কিছুটা তাদের নিজস্ব বোধশক্তির অভাব। এমতাবস্থায় অলীক কল্পনাবিলাস ছাড়া সত্যানুসন্ধান কিরূপে সম্ভব? কথায় বলে, "এমনিতেই কড়লা, তা আবার নিম গাছের।" এতে মিষ্টতা কোথায়।

তাদের এ কুসংস্কার প্রীতির জন্য আলেম সম্প্রদায়ের বিশ্বাসঘাতকতাই প্রধানত দায়ী। এ কারণে তারা সাধারণ লোক অপেক্ষা বেশী অপরাধী। পরের আয়াতে তাই বলা হচ্ছে ঃ

(সাধারণ লোকের মূর্খতার জন্য আলেমরাই যখন দায়ী, তখন) বড় আক্ষেপ তাদের হবে, যারা (বিকৃত করে) গ্রন্থ (অর্থাৎ তওরাত) স্বহস্তে লেখে এবং পরে (জন-সাধারণকে) বলে যে, এ নির্দেশ আল্লাহ্র পক্ষ থেকে (এভাবেই) এসেছে। উদ্দেশ্য (শুধু) তার দ্বারা কিছু নগদ অর্থ-কড়ি বাগিয়ে নেওয়া। অতএব, তাদের বড় আক্ষেপ হবে গ্রন্থ বিকৃত করার জন্য, যা তারা স্বহস্তে লিখেছিল এবং বড় আক্ষেপ হবে তাদের (নগদ অর্থ) উপার্জনের জন্য।

জনগণের সন্তুষ্টির প্রতি লক্ষ্য রেখে ভুল বিষয় পরিবেশন করলে তারা কিছু নগদ অর্থ কড়িও পেয়ে যেত এবং মান-সম্মানও বজায় থাকত। এ কারণে তারা তওরাতে শাব্দিক ও মর্মগত—উভয় প্রকার পরিবর্তন করার চেষ্টা করত। উল্লিখিত আয়াতে এ বিষয়ের উপরই কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারিত হয়েছে।

وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً ۚ قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ ۖ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٨٠﴾

(৮০) তারা বলে ঃ আগুন আমাদিগকে কখনও স্পর্শ করবে না ; কিন্তু কয়েক দিন ব্যতীত। বলে দিন ঃ তোমরা কি আল্লাহ্‌র কাছ থেকে কোন অঙ্গীকার পেয়েছ যে, আল্লাহ্ কখনও তার খেলাফ করবেন না—না তোমরা যা জান না, তা আল্লাহ্‌র সাথে জুড়ে দিচ্ছ।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

ইহুদীরা আরও বলে ঃ দোযখের আগুন কখনও আমাদেরকে স্পর্শ করবে না। (হ্যাঁ) তবে খুব অল্প দিন যা (আঙ্গুলে) গোণা যায়, এমন কয়দিন মাত্র। হে মুহাম্মদ, আপনি বলে দিন ঃ তোমরা কি আল্লাহ্ তা'আলার সাথে এ মর্মে কোন চুক্তি করেছ যে, তিনি স্বীয় চুক্তির বিরুদ্ধাচরণ করবেন না? না, (চুক্তি করনি ; বরং) এমনিতেই আল্লাহ্‌র সাথে এমন কথা জুড়ে দিচ্ছ, যার কোন যুক্তিগ্রাহ্য সনদ তোমাদের কাছে নেই?

তফসীরবিদগণ ইহুদীদের এ বক্তব্যের বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তন্মধ্যে একটি এই যে, ঈমানদার ব্যক্তি গোনাহ্‌গার হলে গোনাহ পরিমাণে দোযখ ভোগ করবে। কিন্তু ঈমানের ফলস্বরূপ চিরকাল দোযখে থাকবে না। কিছুকাল পরই তা থেকে মুক্তি পাবে।

অতএব, ইহুদীদের দাবীর সারমর্ম এই যে, তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী হযরত মূসা (আ) প্রচারিত ধর্ম রহিত হয়নি। কাজেই তারা ঈমানদার। ঈসা (আ) ও হুজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নবুয়ত অস্বীকার করার পরও তারা কাফের নয়। সুতরাং যদি কোন পাপের কারণে তারা দোযখে চলেও যায়, কিন্তু কিছু দিন পরই মুক্তি পাবে। বলা বাহুল্য, এ দাবীটি একটি অসত্যের উপর অসত্যের ভিত্তি বৈ নয়। কেননা মূসা (আ) কর্তৃক প্রচারিত ধর্ম চিরকালের জন্য—এরূপ দাবীই অসত্য। অতএব ঈসা (আ) ও হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের

নবুয়ত অস্বীকার করার কারণে ঈহুদীরা কাফের। কাফেরও কিছুদিন পর দোযখ থেকে মুক্তি পাবে—এমন কথা কোন আসমানী গ্রন্থে নেই—যা আলোচ্য আয়াতে অঙ্গীকার শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত হয়েছে। সুতরাং প্রমাণিত হলো যে, ইহুদীদের দাবীটি যুক্তিহীন বরং যুক্তিবিরুদ্ধ।

بَلٰى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَّاَحَاطَتْ بِهٖ خَطِيْٓـَٔتُهٗ فَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ
النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٨١﴾ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ
اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٨٢﴾

(৮১) হাঁ, যে ব্যক্তি পাপ অর্জন করেছে এবং সে পাপ তাকে পরিবেষ্টিত করে নিয়েছে, তারাই দোযখের অধিবাসী। তারা সেখানেই চিরকাল থাকবে। (৮২) পক্ষান্তরে যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকার্য করেছে, তারাই জান্নাতের অধিবাসী। তারা সেখানেই চিরকাল থাকবে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপে

অনন্তকাল দোযখবাসের বিধি ঃ সামান্য কিছুদিন ছাড়া দোযখের আগুন তোমাদের কেন স্পর্শ করবে না? বরং দোযখেই তোমাদের অনন্তকাল বাস করার কথা। কেননা, আমার বিধি এই যে, যে ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক মন্দ কাজ করে এবং পাপ ও অপকর্ম তাকে এমনভাবে বেষ্টন করে নেয় (যে, কোথাও সততার কোন চিহ্নমাত্র থাকে না,) এমন সব লোকই দোযখের অধিবাসী। তারা সেখানে অনন্তকাল থাকবে। আর যারা (আল্লাহ্ ও রসূলের প্রতি) ঈমান আনে এবং সৎকার্য করে, তারা জান্নাতের অধিবাসী। সেখানে তারা অনন্তকাল থাকবে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

গোনাহ্র দ্বারা পরিবেষ্টিত হওয়ার যে অর্থ তফসীরের সারাংশে উল্লিখিত হয়েছে, তা শুধু কাফেরদের ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে। কারণ কুফরের কারণে কোন সৎকর্মই গ্রহণযোগ্য নয়। কুফরের পূর্বে কিছু সৎকর্ম করে থাকলেও তা নষ্ট হয়ে যায়। এ কারণেই কাফেরদের মধ্যে আপাদমস্তক গোনাহ্ ছাড়া আর কিছুরই কল্পনা করা যায় না। ঈমানদারদের অবস্থা কিন্তু তা নয়। প্রথমত, তাদের ঈমানই একটি বিরাট

সৎকর্ম। দ্বিতীয়ত, অন্যান্য নেক আমল তাদের আমলনামায় লেখা হয়। সে জন্য ঈমানদার সৎকর্মের প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারে না। সুতরাং উল্লিখিত বেষ্টনী তাদের বেলায় অবান্তর।

মোটকথা উপরোক্ত রীতি অনুযায়ী প্রমাণিত হয় যে, কাফেররা অনন্তকাল দোযখে বাস করবে। হযরত মূসা (আ) সর্বশেষ পয়গম্বর নন। তাঁর পর হযরত ঈসা (আ) এবং হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামও পয়গম্বর। তাঁদেরকে অস্বীকার করার কারণে ইহুদীরা কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। ফলে উপরোক্ত বিধি অনুযায়ী তারাও অনন্তকাল দোযখে বাস করবে। সুতরাং তাদের দাবী অকাট্য যুক্তির মাধ্যমে অসার প্রমাণিত হয়েছে।

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ ۖ وَ
بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا
لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۚ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا
قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ ﴿٨٣﴾

(৮৩) যখন আমি বনী-ইসরাঈলের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিলাম যে, তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া কারও ইবাদত করবে না, পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, এতীম ও দীন-দরিদ্রদের সাথে সদ্ব্যবহার করবে, মানুষকে সৎ কথাবার্তা বলবে, নামায প্রতিষ্ঠিত করবে এবং যাকাত দেবে, তখন সামান্য কয়েকজন ছাড়া তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিলে, তোমরাই অগ্রাহ্যকারী।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

স্মরণ কর, যখন আমি (তওরাতে) বনী-ইসরাঈলের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিলাম যে, আল্লাহ্ ছাড়া কারও উপাসনা করবে না, পিতামাতার উত্তম সেবাযত্ন করবে, আত্মীয়-স্বজন, এতিম বালক-বালিকা এবং দীন-দরিদ্রদেরও (সেবাযত্ন করবে) এবং সাধারণ লোকের সাথে যখন কোন কথা বলবে, তখন একান্ত নম্রতার সাথে বলবে। নিয়মিত নামায পড়বে এবং যাকাত দেবে। অতঃপর তোমরা (অঙ্গীকার করে) তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলে কয়েকজন ছাড়া। অঙ্গীকার করে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়াই তোমাদের নিত্যকার অভ্যাস।

জ্ঞাতব্য ঃ 'অল্প কয়েকজন' অর্থাৎ তারাই যারা তওরাতের পুরোপুরি অনুসরণ করত, তওরাত রহিত হওয়ার পূর্বে তারা মূসা (আ) প্রবর্তিত শরীয়তের অনুসারী ছিল এবং তওরাত রহিত হওয়ার পর তারা ইসলামী শরীয়তের অনুসারী হয়ে যায়। আয়াত দৃষ্টে বোঝা যায় যে, একত্ববাদে ঈমান এবং পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, এতীম বালক-বালিকা ও দীন-দরিদ্রদের সেবাযত্ন করা, সব মানুষের সাথে নম্রভাবে কথাবার্তা বলা, নামায পড়া এবং যাকাত দেওয়া ইসলামী শরীয়তসহ পূর্ববর্তী শরীয়তসমূহেও বিদ্যমান ছিল।

শিক্ষা ও প্রচার ক্ষেত্রে কাফেরের সাথেও অসৌজন্যমূলক ব্যবহার করা বৈধ নয় ঃ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا আয়াতে এমন قول বোঝানো হয়েছে, যা সৌন্দর্য-মণ্ডিত। এর অর্থ এই যে, যখন মানুষের সাথে কথা বলবে, নম্রভাবে হাসিমুখে ও খোলা মনে বলবে—যার সাথে কথা বলবে, সে সৎ হউক বা অসৎ, সুন্নী হউক বা বেদাতী। তবে ধর্মের ব্যাপারে শৈথিল্য অথবা কারও মনোরঞ্জনের জন্য সত্য গোপন করবে না। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা যখন মূসা ও হারুন (আ)-কে নবুয়ত দান করে ফেরাউনের প্রতি পাঠিয়েছিলেন তখন এ নির্দেশ দিয়েছিলেন فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا

অর্থাৎ তোমরা উভয়েই ফেরাউনকে নরম কথা বলবে। আজ যারা অন্যের সাথে কথা বলে, তারা হযরত মূসা (আ)-র চাইতে উত্তম নয় এবং যার সাথে বলে, সে ফেরাউন অপেক্ষা বেশী মন্দ ও পাপিষ্ঠ নয়।

তালহা ইবনে ওমর (রা) বলেন ঃ আমি তফসীর ও হাদীসবিদ আ'তা (রহ)-কে বললাম ঃ আপনার কাছে ভ্রান্ত লোকেরাও আনাগোনা করে। কিন্তু আমার মেজায কঠোর। এ ধরনের লোক আমার কাছে এলে আমি ধমক দিয়ে তাড়িয়ে দেই। আ'তা বললেন ঃ তা করবে না। কারণ আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ হচ্ছে এই ঃ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا (মানুষকে সুন্দর কথাবার্তা বল।) ইহুদী-খৃস্টানও এ নির্দেশের আওতাভুক্ত। সুতরাং মুসলমান যত মন্দই হোক, সে কেন এ নির্দেশের আওতায় পড়বে না ?

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم
مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ۝

(৮৪) যখন আমি তোমাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিলাম যে, তোমরা পরস্পর খুনাখুনি করবে না এবং নিজদিগকে দেশ থেকে বহিষ্কার করবে না, তখন তোমরা তা স্বীকার করেছিলে এবং তোমরা তার সাক্ষ্য দিচ্ছিলে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(পূর্বে যে অঙ্গীকার নেওয়া হয়েছিল, এ আয়াতে তারই পরিশিষ্ট বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ) স্মরণ কর সে সময়ের কথা, যখন আমি তোমাদের কাছ থেকে এ অঙ্গীকারও নিলাম যে (গৃহযুদ্ধে লিপ্ত হয়ে) পরস্পর খুনাখুনি করো না এবং একে অন্যকে দেশত্যাগে বাধ্য করো না, তখন (সে অঙ্গীকারকে) তোমরা স্বীকারও করেছিলে, আর (স্বীকারোক্তিও আনুষঙ্গিক ছিল না; বরং এমনভাবে অঙ্গীকার করছিলে যেন) তোমরা তার সাক্ষ্য দিচ্ছিলে।

জ্ঞাতব্য ঃ কোন কোন সময় কারও বক্তব্যের ভেতরেই কোন কিছুর অঙ্গীকারও বোঝা যায় যদিও তা সুস্পষ্ট অঙ্গীকার নয়। কিন্তু আলোচ্য আয়াতে ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ অনিশ্চয়তার অপনোদন করে বলা হয়েছে যে, তাদের অঙ্গীকার সাক্ষ্যদানের মতই সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ছিল।

দেশত্যাগ সম্পর্কিত নিষেধাজ্ঞার অর্থ এই যে, কাউকে এমন উৎপীড়ন করবে না, যাতে সে দেশত্যাগে বাধ্য হয়।

ثُمَّ أَنْتُمْ هٰٓؤُلَآءِ تَقْتُلُوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُوْنَ فَرِيْقًا مِّنْكُمْ
مِّنْ دِيَارِهِمْ تَظٰهَرُوْنَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۖ وَإِنْ
يَّأْتُوْكُمْ أُسٰرٰى تُفٰدُوْهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ ۗ
أَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتٰبِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ ۚ فَمَا جَزَآءُ مَنْ
يَّفْعَلُ ذٰلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَيَوْمَ
الْقِيٰمَةِ يُرَدُّوْنَ إِلٰى أَشَدِّ الْعَذَابِ ۗ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ
عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ۝

(৮৫) অতঃপর তোমরাই পরস্পরে খুনাখুনি করছ এবং তোমাদেরই একদলকে তাদের দেশ থেকে বহিষ্কার করছ। তাদের বিরুদ্ধে পাপ ও অন্যায়ের মাধ্যমে আক্রমণ করছ। আর যদি তারাই কারও বন্দী হয়ে তোমাদের কাছে আসে, তবে বিনিময় নিয়ে তাদের মুক্ত করছ। অথচ তাদের বহিষ্কার করাও তোমাদের জন্য অবৈধ। তবে কি তোমরা গ্রন্থের কিয়দংশ বিশ্বাস কর এবং কিয়দংশ অবিশ্বাস কর! যারা এরূপ করে, পার্থিব জীবনে দুর্গতি ছাড়া তাদের আর কোনই পথ নেই। কিয়ামতের দিন তাদের কঠোরতম শাস্তির দিকে পৌঁছিয়ে দেওয়া হবে। আল্লাহ্ তোমাদের কাজ-কর্ম সম্পর্কে বে-খবর নন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(অঙ্গীকারের উপসংহারে তাদেরকে যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তার লঙ্ঘন সম্পর্কে এ আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে) অতঃপর (সুস্পষ্ট অঙ্গীকারের পর) তোমরা যা করছ, তা স্পষ্ট। আর তা এই যে, তোমরা পরস্পর খুনাখুনিও করছ এবং একে অন্যকে দেশত্যাগেও বাধ্য করছ। (তা এভাবে যে,) নিজেদেরই লোকের বিরুদ্ধে পাপ ও অন্যায়ের মাধ্যমে তাদের শত্রুদের সাহায্য করছ। (এ দু'টি নির্দেশ তো এভাবেই বান্‌চাল করে দিয়েছ। তৃতীয় আরেকটি নির্দেশ, যা পালন করা তোমাদের কাছে সহজ, তা পালনে বেশ তৎপরতা প্রদর্শন করছ। তা হল এই যে,) যদি তাদের কেউ বন্দী হয়ে তোমাদের কারও কাছে আসে, তবে কিছু অর্থের বিনিময়ে তাকে মুক্ত করছ। অথচ (এটা জানা কথা যে,) তাদের দেশ থেকে বহিষ্কার করাও তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ (হত্যা করা তো আরো বেশী নিষিদ্ধ)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

জ্ঞাতব্য ঃ বনী-ইসরাঈলকে তিনটি নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। প্রথমত, খুনাখুনী না করা; দ্বিতীয়ত, বহিষ্কার অর্থাৎ দেশত্যাগে বাধ্য না করা; এবং তৃতীয়ত, সগোত্রের কেউ কারও হাতে বন্দী হলে অর্থের বিনিময়ে তাকে মুক্ত করা। কিন্তু তারা প্রথমোক্ত দু'টি নির্দেশ অমান্য করে তৃতীয় নির্দেশ পালনে বিশেষ তৎপর ছিল। ঘটনার বিবরণ এরূপ ঃ মদীনাবাসীদের মধ্যে 'আওস' ও 'খাযরাজ' নামে দু'টি গোত্র ছিল। তাদের মধ্যে শত্রুতা লেগেই থাকত। মাঝে মাঝে যুদ্ধও বাধত। মদীনার আশেপাশে ইহুদীদের দু'টি গোত্র 'বনী-কুরায়যা' ও 'বনী নাজীর' বসবাস করত। আওস গোত্র ছিল বনী-কুরায়যার মিত্র এবং খাযরাজ গোত্র বনী-নাজীরের মিত্র। আওস ও খাযরাজের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হলে মিত্রতার ভিত্তিতে বনী-কুরায়যা আওসের সাহায্য করত এবং নাজীর খাযরাজের পক্ষ অবলম্বন করত। যুদ্ধে আওস ও খাযরাজের যেমন লোকক্ষয় ও ঘর-বাড়ী বিধ্বস্ত

হত, তাদের মিত্র বনী-কুরায়যা ও বনী-নাজীরেরও তেমনি হত। বনী-কুরায়যাকে হত্যা ও বহিষ্কারের ব্যাপারে শত্রুপক্ষের মিত্র-নাজীরেরও হাত থাকত। তেমনি নাজীরের হত্যা ও বাস্তুভিটা থেকে উৎখাত করার কাজে শত্রুপক্ষের মিত্র বনী-কুরায়যারও হাত থাকত। তবে তাদের একটি আচরণ ছিল অদ্ভুত। ইহুদীদের দুই দলের কেউ আওস অথবা খাযরাজের হাতে বন্দী হয়ে গেলে প্রতিপক্ষীয় দলের ইহুদী স্বীয় মিত্রদের অর্থে বন্দীকে মুক্ত করে দিত। কেউ এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তারা বলত ঃ বন্দীকে মুক্ত করা আমাদের উপর ওয়াজিব। পক্ষান্তরে যুদ্ধে সাহায্য করার ব্যাপারে কেউ আপত্তি করলে তারা বলত ঃ কি করব, মিত্রদের সাহায্যে এগিয়ে না আসা লজ্জার ব্যাপার। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তাদের এ আচরণেরই নিন্দা করেছেন এবং তাদের এ অপকৌশলের মুখোশ উন্মোচন করে দিয়েছেন।

আয়াতে যে সব শত্রু গোত্রকে সাহায্য করার কথা বলা হয়েছে, সেগুলো হলো আওস ও খাযরাজ গোত্র। আওস বনী-কুরায়যার বন্ধুত্ব লাভের জন্য বনী-নাজীরের শত্রু ছিল এবং খাযরাজ বনী-নাজীরের বন্ধুত্ব লাভের জন্য বনী-কুরায়যার শত্রু ছিল।

اثم ও عدوان (গোনাহ্ ও অন্যায়)—আয়াতে ব্যবহৃত এ দু'টি শব্দ দ্বারা দু'রকম হক বা অধিকার নষ্ট করার প্রতি ইঙ্গিত হতে পারে। অর্থাৎ, আল্লাহ্র নির্দেশ অমান্য করে তারা একদিকে আল্লাহ্র হক নষ্ট করেছে এবং অপরকে কষ্ট দিয়ে বান্দার হকও নষ্ট করেছে।

পরবর্তী আয়াতে অঙ্গীকার ভঙ্গের কারণে তিরস্কার করার সাথে সাথে শাস্তির কথাও বর্ণনা করে বলা হয়েছে ঃ

"তোমরা কি (আসলে) গ্রন্থের (তওরাতের) কতক (নির্দেশ) বিশ্বাস কর এবং কতক (নির্দেশ) অবিশ্বাস কর? তোমাদের মধ্যে যে ব্যাক্তি এমন করে, পার্থিব জীবনের দুর্গতি ছাড়া তার আর কি সাজা (হওয়া উচিত)? কিয়ামতের দিন তারা ভীষণ আযাবে নিক্ষিপ্ত হবে। আল্লাহ্ তা'আলা (মোটেই) বে-খবর নন তোমাদের (বিশ্রী) কাজকর্ম সম্বন্ধে।

ঘটনায় বর্ণিত ইহুদীরা নবী করীম (সা)-এর নবুয়ত স্বীকার না করায় নিঃসন্দেহে কাফের। কিন্তু এখানে তাদের কুফর উল্লেখ করা হয়নি; বরং কতিপয় নির্দেশ পালন না করাকে কুফর বলে অভিহিত করা হয়েছে। অথচ যতক্ষণ কেউ হারামকে হারাম মনে করে, ততক্ষণ কাফের হয় না। এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, শরীয়তের পরিভাষায় কঠোর গুনাহ্কে শুধু কঠোরতার প্রেক্ষিতেই কুফর বলে দেওয়া হয়। আমরা নিজেদের পরিভাষায়ও এর দৃষ্টান্ত অহরহ দেখতে পাই। উদাহরণত কাউকে কোন নিকৃষ্ট কাজ করতে দেখলে আমরা বলে দেই ঃ তুই একেবারে চামার। অথচ

সে মোটেই চামার নয়। এক্ষেত্রে তীব্র ঘৃণা এবং সংশ্লিষ্ট কাজটির নিকৃষ্টতা প্রকাশ করাই উদ্দেশ্য। من ترك الصلوة متعمدا فقد كفر (যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে নামায ছেড়ে দেয়, সে কাফের হয়ে যায়)। এবং এ জাতীয় অন্যান্য হাদীসের বেলায়ও এ অর্থই বুঝতে হবে।

আয়াতে উল্লিখিত দু'টি শাস্তির প্রথমটি হলো পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনা ও দুর্গতি। তা এভাবে বাস্তব রূপ লাভ করেছে যে, নবী করীম (সা)-এর আমলেই মুসলমানদের সাথে সম্পাদিত চুক্তিভঙ্গের অপরাধে বনী-কুরায়যা মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত ও বন্দী হয়েছে এবং বনী-নাজীরকে চরম অপমান ও লাঞ্ছনার সাথে সিরিয়ায় নির্বাসিত করা হয়েছে।

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ﴿٨٦﴾

(৮৬) এরাই পরকালের বিনিময়ে পার্থিব জীবন ক্রয় করেছে। অতএব এদের শাস্তি লঘু হবে না এবং এরা সাহায্যও পাবে না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(তাদের শাস্তির কারণ এই যে,) তারাই (নির্দেশ অমান্য করে) পার্থিব জীবনের স্বাদ গ্রহণ করেছে পরকালের (মুক্তির) বিনিময়ে (অথচ মুক্তির উপায় ছিল নির্দেশ মান্য করা)। অতএব, (শাস্তিদাতার পক্ষ থেকে) তাদের শাস্তি লঘু হবে না এবং (কোন উকিল-মোক্তার বা আত্মীয়-স্বজনের পক্ষ থেকে) সাহায্য প্রাপ্ত হবে না।

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ ۖ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ۗ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ ﴿٨٧﴾

(৮৭) অবশ্যই আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছি। এবং তার পরে পর্যায়ক্রমে রসূল পাঠিয়েছি। আমি মরিয়ম-তনয় ঈসাকে সুস্পষ্ট মো'জেযা দান করেছি এবং

পবিত্র রূহের মাধ্যমে তাকে শক্তিদান করেছি। অতঃপর যখনই কোন রসূল এমন নির্দেশ নিয়ে তোমাদের কাছে এসেছে, যা তোমাদের মনে ভাল লাগেনি, তখনই তোমরা অহঙ্কার প্রদর্শন করেছ। শেষ পর্যন্ত তোমরা একদলকে মিথ্যাবাদী বলেছ এবং একদলকে হত্যা করেছ।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হে বনী-ইসরাঈল, আমি (তোমাদের পথ প্রদর্শনের জন্য অনেক বড় বড় আয়োজন করেছি। তন্মধ্যে সর্বপ্রথম) মূসাকে (তওরাত) গ্রন্থ দিয়েছি। তারপর (অন্তর্বর্তীকালে) একের পর এক পয়গাম্বর পাঠিয়েছি। (অতঃপর এ পরিবারের শেষ প্রান্তে) আমি মরিয়ম-তনয় ঈসাকে (নবুয়তের) সুস্পষ্ট প্রমাণাদি (ইঞ্জীল ও মো'জেযা) দান করেছি এবং আমি তাকে পবিত্র রূহ্ (তথা জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম)-এর মাধ্যমে শক্তি দান করেছি (এটিও একটি স্বতন্ত্র প্রমাণ ছিল)। অতঃপর (এটা কি আশ্চর্যের বিষয় নয় যে, এতসব সত্ত্বেও তোমরা অবাধ্যতায় অটল রইলে এবং) যখনই কোন পয়গাম্বর তোমাদের কাছে এমন নির্দেশ নিয়ে এলেন, যা তোমাদের মনঃপূত হয়নি, তখনই তোমরা (এই পয়গাম্বরের অনুসরণ করতে) অহংকার করতে লাগলে। ফলে (এসব পয়গাম্বরের একদলকে তোমরা মিথ্যাবাদী বলেছ এবং আরেক দলকে (নির্দ্বিধায়) হত্যা করেছ।

কোরআন-হাদীসের বিভিন্ন স্থানে হযরত জিবরাঈল (আ)-কে 'রূহুল কুদুস' (পবিত্রাত্মা) বলা হয়েছে। কোরআনের আয়াত قُلْ نَزَّلَهُ رُوْحُ الْقُدُسِ এবং হাদীসে হযরত হাস্সান ইবনে সাবেতের কবিতা রয়েছে ঃ

وجبرائيل رسول الله فينا - وروح القدس ليس له كفاء

জিবরাঈল (আ)-এর মাধ্যমে ঈসা (আ)-কে কয়েক রকম শক্তি দান করা হয়েছে। প্রথমত, জন্মগ্রহণের সময় শয়তানের স্পর্শ হতে রক্ষা করা হয়েছে। এছাড়া তাঁরই দম করার ফলে মরিয়মের উদরে হযরত ঈসার গর্ভ সঞ্চারিত হয়। বহু ইহুদী ঈসা (আ)-র শত্রু ছিল। এ কারণে দেহরক্ষী হিসাবে জিবরাঈল (আ) তাঁর সাথে সাথে থাকতেন। এমনকি, শেষ পর্যন্ত জিবরাঈল (আ)-এর মাধ্যমেই তাঁকে আকাশে তুলে নেওয়া হয়। ইহুদীরা হযরত ঈসা (আ)-সহ অনেক পয়গাম্বরকে মিথ্যাবাদী বলেছে এবং হযরত যাকারিয়া ও হযরত ইয়াহ্ইয়া (আ)-কে হত্যাও করেছে।

وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ ۚ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا

مَّا يُؤْمِنُونَ ۝

(৮৮) তারা বলে, আমাদের হৃদয় অর্ধাবৃত। এবং তাদের কুফরের কারণে আল্লাহ্ অভিসম্পাত করেছেন। ফলে তারা অল্পই ঈমান আনে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

তারা (ইহুদীরা বিদ্রূপের ভঙ্গিতে) বলে, আমাদের হৃদয় (এমন) সংরক্ষিত (যে, তাতে ধর্ম বিরোধী প্রভাব অর্থাৎ ইসলামের প্রভাব প্রতিফলিত হয় না। নিজ ধর্মের ব্যাপারে আমরা খুব পাকাপোক্ত। আল্লাহ্ বলেন যে, এটা দৃঢ়তা নয়;) বরং তোমাদের কুফরের জন্য আল্লাহ্র অভিসম্পাত (ফলে সত্য ধর্ম ইসলামের প্রতি বিদ্বেষী হয়ে রহিত ধর্মকেই পুঁজি করে নিয়েছে)। ফলে তারা অল্পই ঈমান আনে। (অল্প ঈমান গ্রহণীয় নয়। কাজেই তারা নিঃসন্দেহে কাফের)।

জ্ঞাতব্য ঃ ইহুদীদের 'অল্প ঈমান' ঐ সব বিষয়ে যা তাদের ধর্ম ও ইসলামে সমভাবে বিদ্যমান। যেমন, আল্লাহ্র অস্তিত্ব স্বীকার করা ও কিয়ামতে বিশ্বাস করা, এসব বিষয় তারাও স্বীকার করে। কিন্তু মুহাম্মদ (সা)-এর নবুয়ত ও কোরআনকে অস্বীকার করে। ফলে তাদের ঈমান পূর্ণ নয়।

এ অল্প ঈমানকে আভিধানিক দিক দিয়ে ঈমান বলা হয়েছে। এর অর্থ সাধারণ বিশ্বাস। শরীয়তের পরিভাষায় একে ঈমান বলা যায় না। শরীয়তে সে ঈমানই স্বীকৃত, যা শরীয়ত বর্ণিত সব বিষয় বিশ্বাস করার মাধ্যমে হয়ে থাকে।

وَلَمَّا جَآءَهُمْ كِتٰبٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ
وَكَانُوْا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُوْنَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۚ فَلَمَّا جَآءَهُمْ
مَّا عَرَفُوْا كَفَرُوْا بِهٖ ۚ فَلَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ﴿٨٩﴾

---

(৮৯) যখন তাদের কাছে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে কিতাব এসে পৌঁছাল, যা সে বিষয়ের সত্যায়ন করে, যা তাদের কাছে রয়েছে এবং তারা পূর্বে করত। অবশেষে যখন তাদের কাছে পৌঁছল যাকে তারা চিনে রেখেছিল, তখন তারা তা অস্বীকার করে বসল। অতএব, অস্বীকারকারীদের উপর আল্লাহ্র অভিসম্পাত।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যখন তাদের কাছে এমন (একটি) গ্রন্থ এসে পৌঁছাল (অর্থাৎ কোরআন মজীদ) যা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এসেছে (এবং যা) ঐ গ্রন্থেরও সত্যায়ন করে যা (পূর্ব থেকেই)

তাদের কাছে রয়েছে (অর্থাৎ তওরাত)। অথচ এর পূর্বে স্বয়ং তারা কাফেরদের কাছে (অর্থাৎ আরবের মুশরিকদের কাছে) বলত যে, একজন পয়গম্বর আসবেন এবং তিনি একটি গ্রন্থ নিয়ে আসবেন। কিন্তু পরে যখন তা এল যা তারা চিনত, তখন তারা তা (পরিষ্কার) অস্বীকার করে বসল। অতএব, (এমন) অস্বীকারকারীদের উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত (যারা শুধু পক্ষপাতিত্বের কারণে অস্বীকার করে)।

জ্ঞাতব্য ঃ কোরআনকে তওরাতের 'মুসাদ্দিক' (সত্যায়নকারী) বলা হয়েছে। এর কারণ এই যে, তওরাতে মুহাম্মদ (সা)-এর আবির্ভাব ও কোরআন অবতরণের যেসব ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল কোরআনের মাধ্যমেও সেগুলোর সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে। সুতরাং যারা তওরাতকে স্বীকার করে, তারা কিছুতেই কোরআন ও মুহাম্মদ (সা)-কে অস্বীকার করতে পারে না। তা করতে গেলে তওরাতকেও অস্বীকার করতে হবে।

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর ঃ এ ক্ষেত্রে প্রশ্ন দেখা দিতে পারে যে, তারা যখন সত্যকে সত্য বলেই জানত, তখন তাদেরকে ঈমানদার বলাই উচিত। কাফের বলা হল কেন?

এর উত্তর এই যে, শুধু জানাকে ঈমান বলা যায় না। শয়তানের সত্যজ্ঞান সবার চাইতে বেশী। তাই বলে সে ঈমানদার হয়ে যাবে কি? জানা সত্ত্বে অস্বীকার করার কারণে কুফরের তীব্রতাই বৃদ্ধি পেয়েছে। পরবর্তী আয়াতে তাদের শত্রুতাকে কুফরের কারণ বলে অভিহিত করা হয়েছে।

بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهٖٓ اَنْفُسَهُمْ اَنْ يَّكْفُرُوْا بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ بَغْيًا
اَنْ يُّنَزِّلَ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ۚ
فَبَآءُوْ بِغَضَبٍ عَلٰى غَضَبٍ ۭ وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ۝

(৯০) যার বিনিময়ে তারা নিজেদের বিক্রি করেছে, তা খুবই মন্দ; যেহেতু তারা আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন, তা অস্বীকার করেছে এই হঠকারিতার দরুন যে, আল্লাহ্ স্বীয় বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা অনুগ্রহ নাযিল করেন। অতএব, তারা ক্রোধের উপর ক্রোধ অর্জন করেছে। আর কাফেরদের জন্য রয়েছে অপমানজনক শাস্তি।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(সে অবস্থা খুবই মন্দ,) যার প্রেক্ষিতে তারা (পরকালের শাস্তি থেকে) নিজেদের মুক্ত করতে চায়। (অবস্থাটি এই যে,) তারা কুফর (অস্বীকার) করে এমন বস্তুর প্রতি, যা আল্লাহ্ তা'আলা (একজন পয়গম্বরের উপর) নাযিল করেছেন (অর্থাৎ কোরআন)। এই অস্বীকারও শুধু এরূপ হঠকারিতার দরুন করা হয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা (অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি কেন) অনুগ্রহ নাযিল করলেন! (কুফরের উপর এ হিংসার কারণে) তারা ক্রোধের উপর ক্রোধ অর্জন করেছে। পরকালে এই কাফেরদের এমন শাস্তি দেওয়া হবে, যাতে কষ্ট (তো আছেই), অপমানও থাকবে।

এক ক্রোধ কুফরের কারণে এবং অপর ক্রোধ হিংসার কারণে। এ জন্যই ক্রোধের উপর ক্রোধ বলা হয়েছে। শাস্তির সাথে 'অপমানজনক' শব্দ যোগ করে বলা হয়েছে যে, এ শাস্তি কাফেরদের জন্যই নির্দিষ্ট। কেননা, পাপী ঈমানদারকে যে শাস্তি দেওয়া হবে তা হবে তাকে পাপমুক্ত করার উদ্দেশ্যেই, অপমান করার উদ্দেশ্যে নয়। পরবর্তী আয়াতে তাদের যে উক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে, তা থেকে কুফর প্রমাণিত হয় এবং হিংসাও বোঝা যায়।

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٩١﴾

(৯১) যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহ্ যা পাঠিয়েছেন, তা মেনে নাও, তখন তারা বলে, আমরা মানি, যা আমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। সেটি ছাড়া সবগুলোকে তারা অস্বীকার করে। অথচ এ গ্রন্থটি সত্য এবং সত্যায়ন করে ঐ গ্রন্থের, যা তাদের কাছে রয়েছে। বলে দিন, তবে তোমরা ইতিপূর্বে পয়গম্বরদের হত্যা করতে কেন—যদি তোমরা বিশ্বাসী ছিলে?

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যখন তাদেরকে (ইহুদীদের) বলা হয়, তোমরা ঐসব গ্রন্থের প্রতি ঈমান আন, যা আল্লাহ্ তা'আলা (কয়েকজন পয়গম্বরের প্রতি) নাযিল করেছেন (সেগুলোর মধ্যে

কোরআন অন্যতম)। তখন তারা বলে, আমরা (শুধু) সে গ্রন্থের প্রতিই ঈমান আনব, যা আমাদের প্রতি [হযরত মূসা (আ)-র মাধ্যমে] নাযিল করা হয়েছে (অর্থাৎ তওরাত)। সেটি ছাড়া (অবশিষ্ট) যত গ্রন্থ রয়েছে (যেমন, ইঞ্জীল ও কোরআন) তারা সেগুলোকে অস্বীকার করে। অথচ তওরাত ছাড়া অন্যান্য গ্রন্থও (প্রকৃত) সত্য (এবং বাস্তব। তদুপরি) সেগুলো সত্যায়নও করে ঐ গ্রন্থের, যা তাদের কাছে রয়েছে (অর্থাৎ তওরাত)। আপনি আরও বলে দিন, তবে ইতিপূর্বে তোমরা কেন আল্লাহ্‌র পয়গম্বরদের হত্যা করতে---যদি তোমরা তওরাতের প্রতি বিশ্বাসী ছিলে?

"আমরা শুধু তওরাতের প্রতিই ঈমান আনব, অন্যান্য গ্রন্থের প্রতি ঈমান আনব না"—ইহুদীদের এ উক্তি সুস্পষ্ট কুফর। সেই সাথে তাদের উক্তি 'যা (তওরাত) আমাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে'---এ থেকে প্রতিহিংসা বোঝা যায়। এর পরিষ্কার অর্থ হচ্ছে এই যে, অন্যান্য গ্রন্থ যেহেতু আমাদের প্রতি নাযিল করা হয়নি, কাজেই আমরা সেগুলোর প্রতি ঈমান আনব না। আল্লাহ্ তা'আলা তিন পন্থায় তাদের এ উক্তি খণ্ডন করেছেন ঃ

প্রথমত, অন্যান্য গ্রন্থের সত্যতা ও বাস্তবতা যখন অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত, তখন সেগুলো অস্বীকার করার কোন কারণ থাকতে পারে না। অবশ্য দলীলের মধ্যে কোন আপত্তি থাকলে তারা তা উপস্থিত করে তা দূর করে নিতে পারত। অহেতুক অস্বীকারের কোন অর্থ হয় না।

দ্বিতীয়ত, অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে একটি হচ্ছে কোরআন মজীদ, যা তওরাতেরও সত্যায়ন করে। সুতরাং কোরআন মজীদকে অস্বীকার করলে তওরাতের অস্বীকৃতিও অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

তৃতীয়ত, সকল খোদায়ী গ্রন্থের মতেই পয়গম্বরদের হত্যা করা কুফর। তোমাদের সম্প্রদায়ের লোকেরা কয়েকজন পয়গম্বরকে হত্যা করেছে। অথচ তারা বিশেষভাবে তওরাতের শিক্ষাই প্রচার করতেন। তোমরা সেসব হত্যাকারীকেই নেতা ও পুরোহিত মনে করেছ। এভাবে কি তোমরা তওরাতের সাথেই কুফরি করনি? সুতরাং তওরাতের প্রতি তোমাদের ঈমান আনার দাবী অসার প্রমাণিত হয়ে যায়। মোটকথা, কোন দিক দিয়েই তোমাদের কথা ও কাজ শুদ্ধ ও সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

পরবর্তী আয়াতে আরও কতিপয় যুক্তি দ্বারা ইহুদীদের দাবী খণ্ডন করা হয়েছে।

وَلَقَدْ جَآءَكُمْ مُّوْسٰى بِالْبَيِّنٰتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهٖ وَاَنْتُمْ ظٰلِمُوْنَ ﴿٩٢﴾

(৯২) সুস্পষ্ট মো'জেযাসহ মূসা তোমাদের কাছে এসেছেন। এরপর তার অনুপস্থিতিতে তোমরা গোবৎস বানিয়েছ। বাস্তবিকই তোমরা অত্যাচারী।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হযরত মূসা (আ) তোমাদের কাছে (তওহীদ ও রিসালতের) সুস্পষ্ট মো'জেযা (তথা যুক্তি-প্রমাণসহ) এসেছেন। (কিন্তু) এর পরেও তোমরা গোবৎসকে (উপাস্য) বানিয়েছ মূসা (আ)-র অনুপস্থিতিতে (অর্থাৎ তাঁর তূর পর্বতে চলে যাওয়ার পর)। (এ উপাস্য নির্ধারণে) তোমরা অত্যাচারী ছিলে।

ঘটনাটি ঘটে তওরাত অবতরণের পূর্বে। তখন মূসা (আ)-র নবুয়তের সত্যতা প্রমাণ করার জন্য যেসব যুক্তি-প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত ছিল, আয়াতে بَيِّنٰت বলে সেগুলোকেই বোঝানো হয়েছে। যেমন—লাঠি, জ্যোতির্ময় হাত, সাগর দ্বি-খণ্ডিত হওয়া ইত্যাদি।

ইহুদীদের দাবীর খণ্ডনে আয়াতে বলা হয়েছে যে, তোমরা একদিকে ঈমানের দাবী কর, অন্যদিকে প্রকাশ্য শিরকে লিপ্ত হও। ফলে শুধু মূসা (আ)-কেই নয়, আল্লাহ্‌কেও মিথ্যা প্রতিপন্ন করে চলছ। কোরআন অবতরণের সময় হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর আমলে যেসব ইহুদী ছিল, তারা গোবৎসকে উপাস্য নির্ধারণ করেনি সত্য; কিন্তু তারা নিজেদের পূর্ব-পুরুষদের সমর্থক ছিল। অতএব তারাও মোটামুটিভাবে এ আয়াতের লক্ষ্য।

এ থেকে আরও বোঝা যায় যে, যাদের পূর্ব-পুরুষরা মূসা (আ)-কে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করে কুফর করেছে, তারা মুহাম্মদ (সা)-কে অস্বীকার করলে তা তেমন আশ্চর্যের বিষয় নয়।

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ ۖ خُذُوا مَا
آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا ۖ قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا ۚ وَأُشْرِبُوا فِي
قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ ۚ قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ
مُؤْمِنِينَ ﴿٩٣﴾

(৯৩) আর যখন আমি তোমাদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি নিলাম এবং তূর পর্বতকে তোমাদের উপর উঁচু করে ধরলাম যে, শক্ত করে ধর, আমি যা তোমাদের দিয়েছি আর

শোন। তারা বলল, আমরা শুনেছি আর অমান্য করেছি। কুফরের কারণে তাদের অন্তরে গোবৎস-প্রীতি পান করানো হয়েছিল। বলে দিন, তোমরা বিশ্বাসী হলে, তোমাদের সে বিশ্বাস মন্দ বিষয়াদি শিক্ষা দেয়।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

স্মরণ কর, যখন আমি তোমাদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলাম এবং (এ প্রতিশ্রুতি নেওয়ার জন্য) তূর পর্বতকে তোমাদের (মাথার) ওপর উঁচু করে ধরেছিলাম, (তখন আদেশ করেছিলাম যে,) বিধান হিসাবে যা আমি তোমাদের দিয়েছি তা দৃঢ়ভাবে গ্রহণ কর এবং (সেগুলোকে অন্তর দ্বারা) শোন। তখন তারা (ভয়ের আতিশয্যে মুখে বলল ঃ আমরা কবুল করলাম এবং শুনলাম (কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ স্বীকারোক্তিটি আন্তরিক ছিল না। তাই তারা যেন একথাও বলছিল যে) আমাদের দ্বারা এসব পালন করা হবে না। তাদের (এহেন হীনমন্যতার কারণ ছিল এই যে, সাবেক কুফরের কারণে তাদের) অন্তরের (রন্ধ্রে রন্ধ্রে) গোবৎস-প্রীতি বদ্ধমূল হয়ে বসেছিল। (ভূমধ্য-সাগর পাড়ি দেওয়ার পর এক সম্প্রদায়কে মূর্তিপূজায় লিপ্ত দেখে তারাও সাকীর উপাস্যের পূজা বৈধ করার জন্য আবেদন করেছিল)। আপনি বলে দিন যে, তোমরা স্বকল্পিত ঈমানের পরিণতি দেখে নিয়েছ। বস্তুত এসবের পরিণতি মন্দ, তোমাদেরকে তোমাদের ঈমান যা শিক্ষা দেয়---যদিও তোমরা তোমাদের ধারণামতে ঈমানদার হও (অর্থাৎ এটা প্রকৃতপক্ষে ঈমানই নয়)।

আয়াতে বর্ণিত কারণ ও ঘটনাসমূহের সারমর্ম এই যে, ভূমধ্যসাগর পাড়ি দেওয়ার পর তারা একটি কুফরী বাক্য উচ্চারণ করে। পরে মূসা (আ)-র শাসানোর ফলে যদিও তওবা করে নেয়, কিন্তু তওবারও বিভিন্ন স্তর রয়েছে। উচ্চস্তরের তওবার অভাবে তাদের অন্তরে কুফরের অন্ধকার কিছু অবশিষ্ট থেকে যায়। পরে সেটাই বেড়ে গিয়ে গোবৎস পূজার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কোন কোন টীকাকারের বর্ণনা মতে গোবৎস পূজা থেকে তওবা করতে গিয়ে তাদের কিছু লোককে মৃত্যুবরণ করতে হয় এবং কিছু লোক সম্ভবত এমনিতেই ক্ষমা প্রাপ্ত হয়। এদের তওবাও সম্ভবত দুর্বল ছিল। এছাড়া যারা গোবৎস পূজায় জড়িত ছিল না, তারাও অন্তরে গোবৎস পূজারীদের প্রতি প্রয়োজনীয় ঘৃণা পোষণ করতে পারেনি। ফলে তাদের অন্তরে শিরকের প্রভাব কিছু না কিছু অবশিষ্ট ছিল। মোটকথা, তওবার দুর্বলতা ও শিরকের প্রতি প্রয়োজনীয় ঘৃণার অভাব---এতদুভয়ের প্রতিক্রিয়ায় তাদের অন্তরে ধর্মের প্রতি শৈথিল্য দানা বেঁধে উঠেছিল। এ কারণেই অঙ্গীকার নেওয়ার জন্য তূর পর্বতকে তাদের মাথার উপর ঝুলিয়ে রাখা দরকার হয়েছিল।

قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ
النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٩٤﴾ وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا
بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿٩٥﴾

(৯৪) বলে দিন, যদি আখেরাতের বাসস্থান আল্লাহ্‌র কাছে একমাত্র তোমাদের জন্যই বরাদ্দ হয়ে থাকে—অন্য লোকদের বাদ দিয়ে, তবে মৃত্যু কামনা কর, যদি সত্যবাদী হয়ে থাকে। (৯৫) কস্মিনকালেও তারা মৃত্যু কামনা করবে না ঐসব গোনাহর কারণে, যা তাদের হাত পাঠিয়ে দিয়েছে। আল্লাহ্ গোনাহ্‌গারদের সম্পর্কে সম্যক অবগত রয়েছেন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(কতক ইহুদীর দাবী ছিল যে, পরকালের নেয়ামতসমূহ একমাত্র তাদেরই প্রাপ্য। এ দাবীর খণ্ডনে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন) আপনি (তাদেরকে) বলে দিন, (তোমাদের কথামত) পরকাল যদি সবাইকে বাদ দিয়ে, একমাত্র তোমাদের জন্যই সুখকর হয়, তবে তোমরা (এর সত্যতা প্রমাণের জন্য) মৃত্যু কামনা করে দেখাও যদি তোমরা (এ দাবীতে) সত্যবাদী হয়ে থাক। (এতদসঙ্গে আমি আরও বলে দিচ্ছি যে,) তারা কস্মিনকালেও মৃত্যু কামনা করবে না—ঐসব (কুফর) কাজ-কর্মের (শাস্তির ভয়ের) কারণে, যা তারা স্বহস্তে অর্জন করে পাঠিয়েছে। আল্লাহ্ সম্যক অবগত রয়েছেন এহেন জালেমদের (অবস্থা) সম্পর্কে (মোকদ্দমার তারিখ আসতেই অভিযোগনামা পাঠ করে শুনিয়ে শাস্তির নির্দেশ জারি করা হবে)।

কোরআনের আরও কতিপয় আয়াত থেকে তাদের উপরোক্ত দাবীর কথা জানা যায় যেমন— وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً

(তারা বলে, দোযখের আগুন আমাদের স্পর্শ করবে না—তবে অল্প কয়েকদিন মাত্র।)

وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ

(তারা বলে, একমাত্র যারা ইহুদী অথবা নাসারা, তারাই বেহেশতে প্রবেশ করবে —অন্য কেউ নয়।)

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارٰى نَحْنُ اَبْنٰٓؤُا اللّٰهِ وَاَحِبَّآؤُهٗ

(ইহুদী ও খৃস্টানরা বলে, আমরাই আল্লাহ্‌র সন্তান ও প্রিয়জন।)

এ সব দাবীর সারমর্ম এই যে, আমরা সত্য ধর্মের অনুসারী। কাজেই আখেরাতে আমাদের মুক্তি অবধারিত। আমাদের মধ্যে যারা তওবা করেছে অথবা গতায়ু হয়ে গেছে, প্রাথমিক পর্যায়েই জান্নাতে প্রবেশাধিকার পাবে। আর যারা গোনাহ্‌গার, তারা অল্প কয়েকদিন সাজা ভোগ করেই মুক্তি পাবে। পক্ষান্তরে যারা অনুগত, তারা সন্তান ও স্বজনের মতই প্রিয়পাত্র ও নৈকট্যশীল হবে।

কতিপয় শাব্দিক ত্রুটি ছাড়া এসব দাবী সত্য ধর্মের অনুসারী হলে সঠিক ও নির্ভুল। কিন্তু ধর্ম রহিত হয়ে যাওয়ার কারণে ইহুদীরা সত্য ধর্মের অনুসারী ছিল না। এ কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন শব্দ ও পন্থায় তাদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছেন। এখানে একটি বিশেষ পন্থা বর্ণিত হয়েছে। তা এই যে, সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী আলোচনা ও যুক্তি-প্রমাণের মাধ্যমে মীমাংসায় আসতে না চাইলে, অলৌকিক পন্থা অর্থাৎ মোবাহেলার মাধ্যমে মীমাংসা হওয়াই উচিত। এতে বেশী জ্ঞান-বুদ্ধি ও চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজন নেই---শুধু মুখে কথা বলাই যথেষ্ট। কিন্তু আমি ভবিষ্যদ্বাণী করছি, তোমরা মুখেও "আমরা মৃত্যু কামনা করি" বলে বলতে পারবে না।

এ ভবিষ্যদ্বাণীর পর আমি বলছি, যদি তোমরা তোমাদের দাবীতে সত্য হয়ে থাক, তবে বলে দাও। না বললে তোমরা যে মিথ্যাবাদী তা প্রমাণিত হয়ে যাবে।

ইহুদীরা দিবালোকের মত স্পষ্টভাবে জানত যে, তারা মিথ্যা ও কুফরের অনুসারী এবং রসূলুল্লাহ্ (সা) ও মু'মিনগণ সত্যধর্মের অনুসারী। এ কারণে তাদের মনে এমন আতঙ্ক দেখা দিল যে, জিহবাও আন্দোলিত হল না। অথবা তাদের ভয় হল যে, এ বাক্য মুখে উচ্চারণ করতেই মৃত্যুমুখে পতিত হতে হবে। এরপর সোজা জাহান্নাম। এরূপ না হলে রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে তাদের শত্রুতার পরিপ্রেক্ষিতে আনন্দে গদগদ হয়ে মৃত্যুকামনার বাক্য মুখে উচ্চারণ করাই ছিল তাদের পক্ষে স্বাভাবিক।

প্রকৃতপক্ষে ইসলাম যে সত্য ধর্ম, তা প্রমাণ করার জন্য এ ঘটনাটি যথেষ্ট। এখানে আরও দু'টি বিষয় উল্লেখযোগ্য ঃ

প্রথমত, নবী করীম (সা)-এর আমলে বিদ্যমান ইহুদীদের সঙ্গে উপরোক্ত যুক্তির অবতারণা করা হয়েছিল---যারা তাকে নবী হিসাবে চেনার পরেও শত্রুতা ও হঠকারিতাবশত অস্বীকার করেছিল, সকল যুগের ইহুদীদের সঙ্গে নয়।

দ্বিতীয়ত, এখানে এরূপ সন্দেহ করা ঠিক নয় যে, মন ও জিহবা উভয়ের দ্বারাই কামনা হতে পারে। ইহুদীরা সম্ভবত মনে মনে মৃত্যুর কামনা করেছে। উত্তর এই যে, প্রথমত, আল্লাহ্‌র উক্তি ولن يتمنوه (কস্মিনকালেও তারা মৃত্যু কামনা করবে না) এ সম্ভাবনাকে নাকচ করে দিচ্ছে। দ্বিতীয়ত, তারা মনে মনে মৃত্যু কামনা করে থাকলে তা অবশ্যই মুখেও প্রকাশ করত। কারণ, এতে তাদেরই জয় হত এবং নবী করীম (সা)-কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার একটা সুযোগ পেয়ে যেত।

এরূপ সন্দেহও অমূলক যে, বোধ হয় তারা কামনা করেছে; কিন্তু তার প্রচার হয়নি। কারণ, সর্বযুগেই ইসলামের শত্রু ও সমালোচকদের সংখ্যা ইসলামের মিত্র ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের সংখ্যার চাইতে বেশী ছিল। এরূপ কোন ঘটনা ঘটে থাকলে তারা কি একে ফলাও করে প্রচার করত না যে, দেখ, তোমাদের নির্ধারিত সত্যের মাপ-কাঠিতেও আমরা পুরোপুরি উত্তীর্ণ হয়েছি।

وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَوٰةٍ ۛ وَمِنَ الَّذِينَ
أَشْرَكُوا ۛ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ ۖ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ
مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ ۗ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿٩٦﴾

(৯৬) আপনি তাদেরকে জীবনের প্রতি সবার চাইতে এমন কি, মুশরিকদের চাইতেও অধিক লোভী দেখবেন। তাদের প্রত্যেকে কামনা করে, যেন হাজার বছর আয়ু পায়। অথচ এরূপ আয়ু প্রাপ্তি তাহাদেরকে শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারবে না। আল্লাহ্ দেখেন, যা কিছু তারা করে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(তারা মৃত্যু কি কামনা করবে? বরং) আপনি তাদেরকে (পার্থিব) জীবনের প্রতি (অপরাপর) লোকদের চাইতে এমন কি আশ্চর্যের বিষয় এই যে, মুশরিকদের চাইতেও বেশী লোভী দেখবেন। (তাদের অবস্থা এই যে) তাদের একেকজন এরূপ কামনায় মগ্ন যে, তার বয়স যদি হাজার বছর হতো! অথচ (যদি ধরে নেওয়া যায় যে, তার বয়স এতটুকু হয়েই গেল, তবে) এরূপ আয়ু প্রাপ্তি তাকে শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারবে না। তাদের (মন্দ) কাজকর্ম আল্লাহ্‌র দৃষ্টির সামনেই রয়েছে (কাজেই তারা অবশ্যই শাস্তি পাবে।)

আরবের মুশরিকরা পরকালে বিশ্বাসী ছিল না। তাদের মতে বিলাস-ব্যসন ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সবই ছিল পার্থিব। এ কারণে তারা দীর্ঘায়ু কামনা করলে তা মোটেই আশ্চর্যের বিষয় ছিল না। কিন্তু ইহুদীরা শুধু পরকালে বিশ্বাসীই ছিল না; বরং তাদের ধারণামতে পরকালের যাবতীয় আরাম-আয়েস ও নেয়ামতরাজি তাদেরই প্রাপ্ত ছিল। এরপরও তাদের পৃথিবীতে দীর্ঘায়ু কামনা করা বিস্ময়কর ব্যাপার নয় কি?

সুতরাং পরকালের বিশ্বাস সত্ত্বেও তাদের দীর্ঘায়ু কামনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, পারলৌকিক নেয়ামত সম্পর্কিত তাদের দাবী সম্পূর্ণ অন্তঃসারশূন্য। প্রকৃত ব্যাপার তাদেরও ভালভাবে জানা রয়েছে যে, সেখানে পৌঁছলে জাহান্নামই হবে তাদের আবাস-স্থল। তাই যতদিন বাঁচা যায়, ততদিনই মঙ্গল।

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ
اللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٩٧﴾
مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ
فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ ﴿٩٨﴾

(৯৭) আপনি বলে দিন যে কেউ জিবরাঈলের শত্রু হয়—যেহেতু তিনি আল্লাহ্‌র আদেশে এ কালাম আপনার অন্তরে নাযিল করেছেন, যা সত্যায়নকারী তাদের সম্মুখস্থ কালামের এবং মু'মিনদের জন্য পথপ্রদর্শক ও সুসংবাদদাতা। (৯৮) যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তাঁর ফেরেশতা ও রসূলগণ এবং জিবরাঈল ও মিকাঈলের শত্রু হয়, নিশ্চিতই আল্লাহ্ সেসব কাফেরের শত্রু।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(জিবরাঈল (আ) ওহী নিয়ে আগমন করেন---একথা রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মুখে শুনে কতক ইহুদী বলতে থাকে, ইনি তো আমাদের শত্রু; আমাদের সম্প্রদায়ের উপর প্রলয়ঙ্করী ঘটনাবলী এবং প্রাণান্তকর নির্দেশাবলী তাঁর মাধ্যমেই অবতীর্ণ হয়েছে। পক্ষান্তরে মিকাঈল (আ) অত্যন্ত গুণী ফেরেশতা। তিনি বৃষ্টি ও রহমতের সাথে জড়িত। তিনি ওহী নিয়ে এলে আমরা তা মেনে নিতাম। এসব বক্তব্যের খণ্ডনে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, হে মুহাম্মদ!) আপনি বলে দিন, যদি কেউ জিবরাঈলের

প্রতি শত্রুতা রাখে, সেটা তার ব্যক্তিগত ব্যাপার। কোরআন মানা-না-মানার সাথে এর কি সম্পর্ক? কারণ, তিনি তো দূত ছাড়া আর কিছু নন। যেহেতু তিনি আল্লাহ্‌র আদেশে এ কালামে পাক আপনার অন্তর পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিয়েছেন, সুতরাং তার বৈশিষ্ট্য না দেখে স্বয়ং কোরআনকে দেখা দরকার। কোরআন (এর অবস্থা এই যে) সে পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহের সত্যায়ন করে (প্রয়োজনীয় বিষয়াদির প্রতি) পথ প্রদর্শন করে এবং মু'মিনদের সুসংবাদ দেয় (আসমানী কিতাবসমূহের অবস্থা তা-ই হয়ে থাকে)। সুতরাং কোরআন সর্বাবস্থায় খোদায়ী গ্রন্থ এবং অনুসরণযোগ্য। জিবরাঈলের সাথে শত্রুতার দোহাই দিয়ে একে অমান্য করা নিরেট বোকামী ছাড়া আর কিছু নয়। এখন জিবরাঈলের সাথে শত্রুতা সম্পর্কে কথা এই যে, স্বয়ং আল্লাহ্‌র সাথে অথবা অন্য ফেরেশতাদের সাথে অথবা পয়গম্বরদের সাথে শত্রুতা পোষণ করা অথবা স্বয়ং মিকাঈলের সাথে, যার সাথে বন্ধুত্ব দাবী করা হয়—সবই আল্লাহ্ তা'আলার কাছে সমপর্যায়ের। এসব শত্রুতার পরিণতি এই যে, যে কেউ আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর ফেরেশতা ও রসূলগণের এবং জিবরাঈল ও মিকাঈলের শত্রু হয় (তবে এসব শত্রুতার শাস্তি এই যে) নিশ্চয়ই আল্লাহ্ এমন কাফেরদের শত্রু।

وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ ۚ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ ﴿٩٩﴾

(৯৯) আমি আপনার প্রতি উজ্জ্বল নিদর্শনসমূহ অবতীর্ণ করেছি। অবাধ্যরা ব্যতীত কেউ এগুলো অস্বীকার করে না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

[কতক ইহুদী হুযুর (সা)]-কে বলেছিল, আমরাও জানি এমন কোন উজ্জ্বল নিদর্শন আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়নি। এর উত্তরে বলা হয়েছে, একটি উজ্জ্বল নিদর্শনই তাদের সম্বল। অথচ) আমি আপনার প্রতি বহু উজ্জ্বল নিদর্শন অবতারণ করেছি। (সেগুলো তারাও খুব চিনে। তাদের অস্বীকার অজ্ঞতার কারণে নয়; আদেশ লঙ্ঘনের চিরাচরিত বদঅভ্যাসের কারণে। আর স্বতঃসিদ্ধ রীতি এই যে) আদেশ লঙ্ঘনে অভ্যস্তরা ব্যতীত কেউ এমন নিদর্শনাবলী অস্বীকার করে না।

أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٠٠﴾

(১০০) কি আশ্চর্য, যখন তারা কোন অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়, তখন তাদের একদল তা ছুঁড়ে ফেলে বরং অধিকাংশই বিশ্বাস করে না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

[রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি ঈমান আনার ব্যাপারে তওরাতে ইহুদীদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নেওয়া হয়েছিল। কতক ইহুদীকে সে অঙ্গীকার স্মরণ করিয়ে দেওয়া হলে তারা অঙ্গীকার করেনি বলে পরিষ্কার জানিয়ে দেয়। সে সম্পর্কে বলা হচ্ছে, তারা কি এ অঙ্গীকার করার কথা অস্বীকার করে? তাদের অবস্থা এই যে, তারা স্বীকৃত অঙ্গীকারগুলোও কোনদিন পূর্ণ করেনি, বরং) যখন তারা (ধর্ম সম্পর্কে) কোন অঙ্গীকার করেছে, তখন (অবশ্যই) তাদের কোন-না-কোন দল তা উপেক্ষা ভরে ছুঁড়ে ফেলেছে! বরং তাদের অধিকাংশই এমন, যারা (গোড়া থেকেই এ অঙ্গীকারকে) বিশ্বাস করে না।

এখানে বিশেষভাবে 'একদল' বলার কারণ এই যে, তাদের কেউ কেউ উপরোক্ত অঙ্গীকার পূর্ণও করতো। এমন কি, শেষ পর্যন্ত তারা রসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি ঈমানও এনেছিল।

وَلَمَّا جَآءَهُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ
نَبَذَ فَرِيْقٌ مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ ۘ كِتٰبَ اللّٰهِ وَرَآءَ
ظُهُوْرِهِمْ كَاَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝

(১০১) যখন তাদের কাছে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে একজন রসূল আগমন করলেন—যিনি ঐ কিতাবের সত্যায়ন করেন, যা তাদের কাছে রয়েছে, তখন আহ্লে কিতাবদের একদল আল্লাহ্র গ্রন্থকে পশ্চাতে নিক্ষেপ করল—যেন তারা জানেই না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

[এ আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি ঈমান না আনার ব্যাপারে একটি বিশেষ অঙ্গীকার ভঙ্গের বিষয় বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ) যখন তাদের কাছে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে একজন মহান পয়গম্বর আসলেন, যিনি (রসূল হওয়ার সাথে

সাথে) ঐ কিতাবেরও সত্যায়ন করেন, যা তাদের কাছে রয়েছে (অর্থাৎ তওরাত) তাতে হযরত রসূলে করীম (সা)-এর নবুয়তের সংবাদ ছিল। এমতাবস্থায় হযরত রসূলে করীম (সা)-এর প্রতি ঈমান আনা তওরাতের নির্দেশ পালনেরই নামান্তর ছিল। তওরাতকে তারাও আল্লাহ্‌র গ্রন্থ মনে করত। কিন্তু এতদসত্ত্বেও এ আহলে কিতাবদের একদল স্বয়ং আল্লাহ্‌র গ্রন্থকেই (এমনভাবে) পিঠের পশ্চাতে নিক্ষেপ করলো, যেন তারা (সে গ্রন্থের বিষয়বস্তু অথবা আল্লাহ্‌র গ্রন্থ হওয়া সম্পর্কে কিছু) জানেই না।

وَاتَّبَعُوْا مَا تَتْلُوا الشَّيٰطِيْنُ عَلٰى مُلْكِ سُلَيْمٰنَ ۚ وَمَا كَفَرَ
سُلَيْمٰنُ وَلٰكِنَّ الشَّيٰطِيْنَ كَفَرُوْا يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ ۗ وَمَآ
اُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوْتَ وَمَارُوْتَ ۭ وَمَا يُعَلِّمٰنِ
مِنْ اَحَدٍ حَتّٰى يَقُوْلَآ اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ۭ فَيَتَعَلَّمُوْنَ
مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُوْنَ بِهٖ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهٖ ۭ وَمَا هُمْ بِضَاۗرِّيْنَ
بِهٖ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ۭ وَيَتَعَلَّمُوْنَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا
يَنْفَعُهُمْ ۭ وَلَقَدْ عَلِمُوْا لَمَنِ اشْتَرٰىهُ مَا لَهٗ فِي الْاٰخِرَةِ
مِنْ خَلَاقٍ ۭ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهٖٓ اَنْفُسَهُمْ ۭ لَوْ كَانُوْا
يَعْلَمُوْنَ ۝ وَلَوْ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَمَثُوْبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ
خَيْرٌ ۭ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ۝

(১০২) তারা ঐ শাস্ত্রের অনুসরণ করল, যা সুলায়মানের রাজত্বকালে শয়তানরা আবৃত্তি করত। সুলায়মান কুফর করেনি; শয়তানরাই কুফর করেছিল। তারা মানুষকে যাদুবিদ্যা এবং বাবেল শহরে হারূত ও মারূত—দুই ফেরেশতার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছিল, তা শিক্ষা দিত। তারা উভয়েই একথা না বলে কাউকে শিক্ষা দিত না যে, আমরা পরীক্ষার জন্য; কাজেই তুমি কাফির হয়ো না। অতঃপর তারা তাদের কাছ

থেকে এমন যাদু শিখত, যদ্দ্বারা স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে। তারা আল্লাহ্‌র আদেশ ছাড়া তদ্দ্বারা কারো অনিষ্ট করতে পারত না। যা তাদের ক্ষতি করে এবং উপকার না করে, তারা তাই শিখে। তারা ভালরূপে জানে যে, যে কেউ যাদু অবলম্বন করে, তার জন্য পরকালে কোন অংশ নেই। যার বিনিময়ে তারা আত্মবিক্রয় করেছে, তা খুবই মন্দ— যদি তারা জানত। (১০৩) যদি তারা ঈমান আনত এবং খোদাভীরু হত, তবে আল্লাহ্‌র কাছ থেকে উত্তম প্রতিদান পেত। যদি তারা জানত!

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(ইহুদীরা এমন নির্বোধ যে) তারা (আল্লাহ্ প্রদত্ত কিতাবের অনুসরণ না করে,) ঐ শাস্ত্রের (অর্থাৎ যাদুর) অনুসরণ করল, যা সুলায়মানের রাজত্বকালে শয়তানেরা চর্চা করত। (কতক নির্বোধ হযরত সুলায়মানকে যাদুকর মনে করত। তাদের এ ধারণা একেবারেই ভিত্তিহীন। কারণ, যাদু বিশ্বাসগতভাবে অথবা কার্যগতভাবে কুফর), সুলায়মান (কখনও) কুফর করেন নি। হাঁ, শয়তানরা (অর্থাৎ দুষ্ট জ্বিনরা অবশ্য) কুফর (অর্থাৎ যাদু) করত। (নিজেরা তো করতই) তারা (অপরাপর) মানুষকেও যাদু শিক্ষা দিত। (সে যাদুই বংশ পরম্পরায় প্রচলিত রয়েছে এবং ইহুদীরা তা-ই শিক্ষা করে। এমনিভাবে তারা ঐ যাদুও অনুসরণ করে, যা বাবেল শহরে 'হারূত' ও 'মারূত'—দুই ফেরেশতার প্রতি (বিশেষ উদ্দেশ্যে) অবতীর্ণ হয়েছিল। তারা উভয়ে (সে যাদু) কাউকে শিক্ষা দিত না, যতক্ষণ না (সাবধান করে আগেই) বলে দিত যে, আমাদের অস্তিত্বও মানুষের জন্য খোদায়ী পরীক্ষা (যে, কে আমাদের কাছ থেকে এ যাদু শিক্ষা করে বিপদে জড়িয়ে পড়ে, আর কে তা থেকে বেঁচে থাকে)। কাজেই তুমি (একথা জেনেও) কাফির হয়ো না (তাহলে বিপদে জড়িয়ে পড়বে)। অতঃপর তারা (কিছু লোক) তাদের (ফেরেশতাদ্বয়ের) কাছ থেকে এমন যাদু শিখত, যদ্দ্বারা স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিত। (এতে কারও এরূপ ধারণার বশবর্তী হয়ে ভীত হওয়া উচিত নয় যে, যাদুকরেরা যা ইচ্ছা, তাই করতে পারে। কেননা, এটা নিশ্চিত যে,) তারা আল্লাহ্‌র (ভাগ্য সম্পর্কিত) আদেশ ব্যতীত তদ্দ্বারা কারও (বিন্দু পরিমাণও) অনিষ্ট করতে পারত না। তারা (এহেন যাদু আয়ত্ত করে) যা তাদের ক্ষতি করে এবং যথার্থ উপকার করে না (সুতরাং যাদু অনুসরণ করে ইহুদীরাও ক্ষতিগ্রস্ত হবে)। আর এটা শুধু আমারই কথা নয়; বরং তাঁরা ভালরূপে জানে যে, যে লোক আল্লাহ্‌র গ্রন্থের বিনিময়ে যাদু অবলম্বন করে, তার জন্য পরকালে কোন অংশ অবশিষ্ট নেই। যার বিনিময়ে তারা আত্মবিক্রয় করেছে (অর্থাৎ যাদু ও কুফর) তা খুবই মন্দ। যদি তারা (কুফর ও দুষ্কর্মের পরিবর্তে) ঈমান আনত এবং খোদাভীরু হত, তবে আল্লাহ্‌র কাছ থেকে কুফর ও দুষ্কর্মের চাইতে হাজার গুণ) উত্তম প্রতিদান পেত। যদি তারা বুঝত।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

উল্লিখিত আয়াতসমূহের তফসীর ও শানে নুযুল প্রসঙ্গে অনেক ইসরাঈলী রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়। সেসব রেওয়ায়েত পাঠ করে অনেক পাঠকের মনে নানা প্রশ্ন দেখা যায়। হাকীমুল উম্মত মওলানা আশরাফ আলী থানবী (র) সুস্পষ্ট ও সহজভঙ্গিতে এসব প্রশ্নের উত্তর দান করেছেন। তাঁর বর্ণনাকে যথেষ্ট মনে করে এখানে হুবহু উদ্ধৃত করে দিলাম।

(১) নির্বোধ ইহুদীরাই হযরত সুলায়মান (আ)-কে যাদুকর বলে আখ্যায়িত করত। তাই আল্লাহ্ তা'আলা আয়াতের মাঝখানে তাঁর নিষ্কলুষতাও প্রকাশ করে দিয়েছেন।

(২) বর্ণিত আয়াতসমূহে ইহুদীদের নিন্দা করাই উদ্দেশ্য। কারণ, তাদের মধ্যে যাদুবিদ্যার চর্চা ছিল। এসব আয়াত সম্পর্কে পরমাসুন্দরী যোহ্রার একটি মুখরোচক কাহিনীও সুবিদিত রয়েছে। কাহিনীটি কোন নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়েত দ্বারা সমর্থিত নয়। শরীয়তের নীতিবিরুদ্ধ মনে করে অনেক আলেম কাহিনীটিকে নাকচ করে দিয়েছেন। আবার কেউ কেউ একে সদর্থে ব্যাখ্যা করা শরীয়ত-বিরুদ্ধ মনে না করে নাকচ করেন নি। বাস্তবে কাহিনীটি সত্য কি মিথ্যা, এখানে তা আলোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। তবে এটা ঠিক যে, আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা কাহিনীর উপর নির্ভরশীল নয়।

(৩) সবকিছু জানা সত্ত্বেও ইহুদীরা আমল বা কাজ করত, 'ইলম' বা জানার বিপরীত এবং এ ব্যাপারে তারা মোটেও বিচক্ষণতার পরিচয় দিত না। তাই আয়াতে প্রথমে তাদের জানার সংবাদ দেওয়া হয়েছে এবং পরিশেষে 'যদি তারা জানত' বলে না জানার কথাও বলা হয়েছে। কারণ, যে জানার সাথে তদনুরূপ কাজ ও বিচক্ষণতা যুক্ত হয় না, তা না জানারই শামিল।

(৪) ঠিক কখন, সে সম্পর্কে সুনিশ্চিত তথ্য জানা না থাকলেও এক সময়ে পৃথিবীতে বিশেষ করে বাবেল শহরে যাদুবিদ্যার যথেষ্ট প্রচলন ছিল। যাদুর অত্যাশ্চর্য ক্রিয়া দেখে মূর্খ লোকদের মধ্যে যাদু ও পয়গম্বরগণের মো'জেযার স্বরূপ সম্পর্কে বিভ্রান্তি দেখা দিতে থাকে। কেউ কেউ যাদুকরদেরও সজ্জন ও অনুসরণযোগ্য মনে করতে থাকে। আধুনিক যুগে মেস্‌মেরিজমের বেলায়ও তাই হচ্ছে। এই বিভ্রান্তি দূর করার উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ তা'আলা বাবেল শহরে 'হারূত' ও 'মারূত' নামে দু'জন ফেরেশতা প্রেরণ করেন। তাদের কাজ ছিল যাদুর স্বরূপ ও ভেল্কিবাজি সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করা—যাতে বিভ্রান্তি দূর হয় এবং যাদুর আমল ও যাদুকরদের অনুসরণ থেকে তারা বিরত থাকতে পারে। পয়গম্বরগণের নবুয়তকে যেমন মো'জেযা ও নিদর্শনাদি দ্বারা প্রমাণ করে দেওয়া হয়, তেমনি হারূত ও মারূত যে ফেরেশতা, তার উপর যুক্তি-প্রমাণ খাড়া করে দেওয়া হল, যাতে তাদের নির্দেশাবলী জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়।

এ কাজে পয়গম্বরগণকে নিযুক্ত না করার কারণ এই যে, প্রথমত, এতে পয়গম্বর ও যাদুকরদের মধ্যে পার্থক্য ফুটিয়ে তোলা উদ্দেশ্য ছিল। এদিক দিয়ে তাঁরা যেন ছিলেন একটি পক্ষ। কাজেই উভয় পক্ষকে বাদ দিয়ে তৃতীয় পক্ষকে বিচারক নিযুক্ত করাই বিধেয়।

দ্বিতীয়ত, যাদুর বাক্যাবলী মুখে উচ্চারণ ও বর্ণনা ব্যতীত এ কাজ সম্পন্ন করা সম্ভবপর ছিল না। যদিও 'কুফরের' বর্ণনা কুফর নয়, এই স্বীকৃত নীতি অনুযায়ী পয়গম্বরগণ তা করতে পারতেন, তথাপি হেদায়েতের প্রতীক হওয়ার কারণে এ কাজে তাঁদের নিযুক্তি সমীচীন মনে করা হয়নি। এ কাজের জন্য ফেরেশতাই মনোনীত হন। কারণ, সৃষ্টি জগতে ফেরেশতাদের দ্বারা এমন কাজও নেওয়া হয়, যা সামগ্রিক উপযোগিতার দিক দিয়ে ভাল, কিন্তু অনিষ্টের কারণে স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে মন্দ। যেমন, কোন হিংস্র ও ইতর প্রাণীর লালন-পালন ও দেখাশুনা করা। সৃষ্টিগত দৃষ্টিভঙ্গিতে এ কাজ সঠিক ও প্রশংসনীয়, কিন্তু জাগতিক কল্যাণমূলক আইনের দৃষ্টিতে অঠিক ও নিন্দনীয়। পক্ষান্তরে পয়গম্বরগণকে শুধু জাগতিক কল্যাণমূলক আইন তদারকের কাজেই নিযুক্ত করা হয়—যা সাধারণত ভাল কাজেই হয়ে থাকে। উপরোক্ত যাদুর উচ্চারণ ও বর্ণনা উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে জাগতিক কল্যাণমূলক কাজ হলেও যাদুর আমলে লিপ্ত হয়ে পড়ার (যেমন, বাস্তবে হয়েছে) ক্ষীণ সম্ভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে পয়গম্বরগণকে এ থেকে দূরে রাখাই পছন্দ করা হয়েছে।

মোটকথা, ফেরেশতাদ্বয় বাবেল শহরে কাজ আরম্ভ করে দিলেন। তারা যাদুর মূল ও শাখা-প্রশাখা বর্ণনা করে জনগণকে এ কুকর্ম থেকে আত্মরক্ষা ও যাদুকরদের ঘৃণা করার উপদেশ দিলেন। যেমন কোন আলেম যদি দেখেন যে, জনগণ মূর্খতাবশত কুফরী বাক্য বলে ফেলে, তবে তিনি প্রচলিত কুফরী বাক্যগুলোকে বক্তৃতায় অথবা লেখায় সন্নিবেশিত করে জনগণকে বলে দেবেন যে, এ বাক্যগুলো থেকে সাবধান থাকা দরকার।

ফেরেশতাদ্বয়ের কাজ আরম্ভ করার পর বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন লোক তাদের কাছে আসা-যাওয়া করতে থাকে। পরে যাতায়াতকারীরা অনুরোধ করতে থাকে যে, যাদুর মূল ও শাখা-প্রশাখা সম্পর্কে আমাদেরকেও অবহিত করা হোক যাতে আমরা অজ্ঞতাবশত কোন বিশ্বাসগত অথবা কার্যগত অপকর্মে লিপ্ত হয়ে না পড়ি। তখন ফেরেশতাদ্বয় সাবধানতাবশত একথা বলে দিতেন,—দেখ, আমাদের দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা বান্দার পরীক্ষাও নিতে চান যে, এগুলো শিক্ষা করে কে স্বীয় ধর্মের হেফাজত ও সংস্কার করে এবং কে এগুলো সম্পর্কে অবগত হয়ে নিজেই সে অপকর্মে লিপ্ত হয়ে পড়ে এবং স্বীয় দ্বীন-ঈমান বরবাদ করে দেয়। দেখ, আমাদের উপদেশ এই যে, দুনিয়াতে যাদুবিদ্যা শিক্ষা করে সুনিয়তের উপরই কায়েম থেকো। এমন যেন না হয় যে, আত্মরক্ষার অজুহাতে আমাদের কাছ থেকে শিখে নিজেই অপকর্মে লিপ্ত হয়ে পড় এবং দ্বীন-ঈমান বরবাদ করে বস।

তখন ফেরেশতাদ্বয় এর চাইতে বেশী আর কিই বা করতে পারতেন। তাদের কথামত যারা ওয়াদা-অঙ্গীকার করত, তারা তাদের সামনে যাদুর মূল ও শাখা-প্রশাখা বর্ণনা করে দিতেন। কারণ, এটাই ছিল তাদের কর্তব্য কাজ। এখন যদি কেউ ওয়াদা ভঙ্গ করে স্বেচ্ছায় ও স্বজ্ঞানে কাফির হয়ে যায়, সেজন্য তারা দায়ী হবেন কেন? কেউ কেউ অঙ্গীকার ভঙ্গ করে যাদুকে সৃষ্ট জীবের অনিষ্ট সাধনে নিয়োজিত করে, যা নিশ্চিতরূপেই একটি দুষ্কর্ম। যাদু ব্যবহারের কোন কোন প্রক্রিয়া কুফরপূর্ণও বটে। এভাবে যাদু প্রয়োগকারী কাফিরে পরিণত হয়।

উপরোক্ত বিষয়টির উদাহরণ এভাবে দেওয়া যায়—ধরুন এক ব্যক্তি কোরআন-হাদীস ও যুক্তি-তর্কে পারদর্শী পরহেযগার কোন আলেমের কাছে পৌঁছে বলল, হুযুর, আমাকে প্রাচীন অথবা আধুনিক দর্শন শিখিয়ে দিন—যাতে দর্শনে ইসলামের বিরুদ্ধে যেসব আপত্তি বর্ণিত হয়েছে সে সম্পর্কে নিজেও অবগত হতে পারি এবং বিরোধীদের জওয়াব দিতে পারি। আলেম সাহেব মনে করলেন, লোকটি ধোঁকা দিয়ে দর্শন শিখে একে শরীয়তবিরোধী ভ্রান্ত বিশ্বাসকে জোরদার করার কাজেও ব্যবহার করতে পারে। তাই তিনি আগন্তুককে উপদেশ দিয়ে এরূপ না করতে বললেন। অতঃপর আগন্তুক যথাযথ ওয়াদা করায় আলেম সাহেব তাকে দর্শন পড়িয়ে দিলেন। কিন্তু দর্শন শিক্ষা করার পর লোকটি যদি ইসলাম-বিরোধী বিশ্বাস ও মতবাদকেই বিশুদ্ধ ও নির্ভুল মনে করতে থাকে, তবে শিক্ষক আলেম সাহেবকে কোন পর্যায়ে দোষী সাব্যস্ত করা যায় কি? তেমনিভাবে যাদু বলে দেওয়ার কারণে ফেরেশতাদ্বয়ও দোষী হতে পারেন না।

কর্তব্য সমাধা করার পর সম্ভবত ফেরেশতাদ্বয়কে আকাশে উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। প্রকৃত ব্যাপার আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন। (বয়ানুল-কোরআন)

যাদুর স্বরূপ ঃ অভিধানে "সিহ্‌র" (যাদু) শব্দের অর্থ এমন প্রতিক্রিয়া, যার কারণ প্রকাশ্য নয়।—(কামূস) কারণটি অর্থগতও হতে পারে। যেমন বিশেষ বিশেষ বাক্যের প্রতিক্রিয়া। আবার তা ইন্দ্রিয় বহির্ভূত বিষয়ের প্রতিক্রিয়াও হতে পারে। যেমন, জ্বিন-পরী ও শয়তানের প্রতিক্রিয়া। অথবা মেসমেরিজমে কল্পনাশক্তির প্রতিক্রিয়াও হতে পারে, অথবা এমন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সমূহের প্রতিক্রিয়াও হতে পারে, যা দৃশ্য নয় যেমন দৃষ্টির অন্তরালে থেকে চুম্বকের প্রতিক্রিয়া লোহার জন্য অথবা অদৃশ্য ঔষধ-পত্রের প্রতিক্রিয়াও হতে পারে অথবা গ্রহ-নক্ষত্রের প্রতিক্রিয়াও হতে পারে।

এ কারণেই যাদুর বহু প্রকারভেদ রয়েছে। কিন্তু সাধারণ পরিভাষায় যাদু বলতে এমন বিষয়কে বোঝায়, যাতে জ্বিন ও শয়তানের কারসাজি, কোন কোন শব্দ ও বাক্যের প্রভাব অথবা মেসমেরিজমে কল্পনাশক্তির প্রভাব। কারণ যুক্তি ও চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে এবং প্রাচীন ও আধুনিক দার্শনিকরাও স্বীকার করেন,

অক্ষর ও শব্দাবলীর মধ্যেও বিশেষভাবে কিছু কার্যকারিতা রয়েছে। কোন বিশেষ অক্ষর অথবা শব্দকে বিশেষ সংখ্যায় পাঠ করলে অথবা লিপিবদ্ধ করলে বিশেষ বিশেষ প্রভাব প্রত্যক্ষ করা যায়। মানুষের চুল-নখ ইত্যাদি অথবা ব্যবহারের কাপড়ের সাথে অন্যান্য বস্তু-সামগ্রী একত্রিত করেও কিছু কার্যকারিতা হাসিল করা যায়; সাধারণ পরিভাষায় এগুলো টোনা-টোটকা (তন্ত্রমন্ত্র) নামে অভিহিত। এগুলোও যাদুর অন্তর্ভুক্ত।

কোরআন ও হাদীসের পরিভাষায় এমন অদ্ভুত কর্মকাণ্ডকে যাদু বলা হয়, যাতে শয়তানকে সন্তুষ্ট করে ওদের সাহায্য নেওয়া হয়। শয়তানদের সন্তুষ্ট করার বিভিন্ন পন্থা রয়েছে। কখনও এমন মন্ত্র পাঠ করা হয়, যাতে শিরক ও কুফরের বাক্যাবলী অথবা শয়তানের প্রশংসাসূচক চরণাবলী থাকে। আবার কখনও গ্রহ ও নক্ষত্রের আরাধনা করা হয়। এতেও শয়তান সন্তুষ্ট হয়।

শয়তানের পছন্দনীয় কাজকর্ম করেও শয়তানকে সন্তুষ্ট করা যায়। উদাহরণত কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা, তার রক্ত ব্যবহার করা, অপবিত্র অবস্থায় থাকা, পবিত্রতা বর্জন করা ইত্যাদি।

পরহেযগারী, পবিত্রতা, আল্লাহ্‌র যিকির পুণ্য কাজ, দুর্গন্ধ ও অপবিত্রতা থেকে দূরে থাকা ইত্যাকার পছন্দনীয় কাজকর্ম অবলম্বন করে যেমন ফেরেশতাদের সাহায্য পাওয়া যায়, তেমনিভাবে শয়তানের পছন্দনীয় কথাবার্তা ও কাজকর্মের মাধ্যমে শয়তানের সাহায্য লাভ করা যায়। এ কারণেই যারা সর্বদা নোংরা ও অপবিত্র থাকে, আল্লাহ্‌র নাম মুখে উচ্চারণ করে না এবং অশ্লীল কাজকর্মে লিপ্ত থাকে, একমাত্র তারাই যাদুবিদ্যায় সফলতা অর্জন করে থাকে। হায়েয অবস্থায় রমণীরা এ কাজ করলে তা খুব কার্যকরী হয়। এ ছাড়া, রূপক অর্থে ভেলিকবাজি, টোট্‌কা, হাতের সাফাই, মেস্‌মেরিজম ইত্যাদিকেও যাদু বলা হয়। (রূহুল মা'আনী)

যাদুর প্রকারভেদ ঃ ইমাম রাগেব ইস্পাহানী 'মুফরাদাতুল-কোরআন' নামক গ্রন্থে লিখেন, যাদু বিভিন্ন প্রকার হয়ে থাকে। তন্মধ্যে এক প্রকার নিছক নজরবন্দি ও কল্পনাপ্রসূত। বাস্তবতা বলতে এতে কিছুই নেই। উদাহরণত কোন কোন ভেল্কিবাজ হাতের সাফাই দ্বারা এমন কাজ করে ফেলে, যা সাধারণ লোক দেখতে সক্ষম হয় না। অথবা মেসমেরিজম তথা কল্পনাশক্তির মাধ্যমে কারও মস্তিষ্কে এমন প্রভাব সৃষ্টি করে যে, সে একটি অবাস্তব বস্তুকে চোখে দেখতে থাকে অথবা কানে শুনতে থাকে। মাঝে মাঝে শয়তানের প্রভাব দ্বারাও মন্ত্রমুগ্ধ ব্যক্তির মস্তিষ্কে ও দৃষ্টিশক্তিতে এমন প্রভাব সৃষ্টি করা যায়। তখন সে অবাস্তব বস্তুকে বাস্তব মনে করতে থাকে। এটা দ্বিতীয় প্রকার যাদু। কোরআন মজীদে বর্ণিত ফেরাউনের যাদুকরদের যাদু ছিল প্রথম প্রকারের। যেমন বলা হয়েছে ঃ سَحَرُوا أَعْيُنَ

النَّاسِ—(তারা মানুষের দৃষ্টিশক্তিতে যাদু করল)। আরও বলা হয়েছে ঃ

يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى তাদের যাদুর ফলে মূসার কল্পনায় ভাসতে লাগল যে, রশির সাপগুলো ইতস্তত ছুটাছুটি করছে)। এখানে يخيل (কল্পনায় ভাসতে লাগল) শব্দ দ্বারা বলা হয়েছে যে, যাদুকরদের নিক্ষিপ্ত রাশ ও লাঠিগুলো প্রকৃতপক্ষে সাপও হয়নি এবং কোনরূপ ছুটাছুটিও করেনি; বরং হযরত মূসার কল্পনাশক্তি প্রভাবান্বিত হয়ে সেগুলোকে ধাবমান সাপ বলে মনে করতে লাগল।

কোরআন মজীদে শয়তানের প্রভাবযুক্ত নজরবন্দি ও কল্পনাপ্রসূত দ্বিতীয় প্রকার যাদুর কথা এভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ

هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ، تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ○

অর্থাৎ—আমি তোমাদের বলি, কাদের উপর শয়তান অবতরণ করে, যত সব মিথ্যা অপবাদ রটনাকারী গোনাহ্গারের উপর শয়তান অবতরণ করে।

অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ-

অর্থাৎ—বরং শয়তানরাই কুফরী করেছে, ওরা মানুষকে যাদু শিক্ষা দিত।

তৃতীয় প্রকার যাদু হচ্ছে যাদুর মাধ্যমে বস্তুর সত্তা পরিবর্তন করে দেওয়া। যেমন, কোন মানুষ অথবা প্রাণীকে পাথর অথবা অন্য প্রাণী বানিয়ে দেওয়া। ইমাম রাগেব ইস্পাহানী, আবূ বকর জাসসাস প্রমুখ পণ্ডিত এই প্রকার যাদুর অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তাঁরা বলেন, যাদুর মাধ্যমে বস্তুর মূল সত্তা পরিবর্তন করা যায় না। বরং যাদুর প্রভাব নজর ও কল্পনা পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকে। মুতাযেলা সম্প্রদায়ও একথাই বলে। কিন্তু সাধারণ আলেমগণের সুচিন্তিত অভিমত এই যে, বস্তুর সত্তা পরিবর্তন যুক্তি ও শরীয়তের দিক দিয়ে অসম্ভব নয়। উদাহরণত মানব-দেহকে পাথরে পরিণত করা যেতে পারে।

কোরআন মজীদে ফেরাউনী যাদুকরদের যাদুকে কল্পনাপ্রসূত বলে আখ্যায়িত করার অর্থ এই নয় যে, সমস্ত যাদুই কাল্পনিক হবে—কল্পনার ঊর্ধ্বে যাদু হবে না। যাদুর মাধ্যমে বস্তুর সত্তা পরিবর্তন করা সম্ভব—এ দাবীর সমর্থনে কেউ কেউ কা'ব

আহ্‌বার বর্ণিত একটি হাদীস পেশ করেন। হাদীসটি 'মুয়াত্তা ইমাম মালেক' গ্রন্থে কা'কা' ইবনে হাকীমের রেওয়ায়েতক্রমে এভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ

لولا كلمات اقولهن لجعلتنى اليهود حمارًا -

"আমি কিছুসংখ্যক বাক্য নিয়মিত পাঠ করি। এগুলো না হলে ইহুদীরা আমাকে গাধা বানিয়ে ছাড়ত।"

'গাধা বানানো' শব্দটি রূপক অর্থে 'বোকা' বানানোর অর্থেও হতে পারে। কিন্তু প্রয়োজন ব্যতিরেকে প্রকৃত অর্থ বাদ দিয়ে রূপক অর্থ নেওয়া ঠিক নয়। তাই হাদীসের প্রকৃত অর্থ এই যে, 'বাক্যগুলো নিয়মিত পাঠ না করলে ইহুদী যাদুকররা আমাকে গাধা বানিয়ে দিত।'

এতদ্বারা দু'টি বিষয় প্রমাণিত হলো ঃ (এক) যাদু দ্বারা মানুষকে গাধা বানানোও সম্ভব। (দুই) তিনি যে কতকগুলো বাক্য নিয়মিত পাঠ করতেন, সেগুলোর প্রভাবে যাদু নিষ্ক্রিয় হয়ে যেত। বাক্যগুলো সম্পর্কে কা'ব আহবারকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি নিম্নোদ্ধৃত বাক্যগুলো উল্লেখ করেন ঃ

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ الَّذِىْ لَيْسَ بِشَيْءٍ اَعْظَمُ مِنْهُ وَبِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ الَّتِىْ لَايُجَاوِزُهُنَّ بَرٌّ وَّلَا فَاجِرٌ وَبِاَسْمَاءِ اللّٰهِ الْحُسْنٰى كُلِّهَا مَا عَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا لَمْ اَعْلَمْ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَبَرَءَ وَذَرَءَ ○

অর্থাৎ (আমি মহান আল্লাহ্‌র আশ্রয় গ্রহণ করি, যাঁর চাইতে মহান কেউ নেই। আমি আল্লাহ্‌র পরিপূর্ণ কালামের আশ্রয় গ্রহণ করি, যা কোন পুণ্যবান কিংবা পাপাচারী অতিক্রম করতে পারে না। আমি আল্লাহ্‌র সুন্দর নামসমূহের আশ্রয় গ্রহণ করি, যেগুলি আমি জানি বা জানি না; প্রত্যেক ঐ বস্তুর অনিষ্ট থেকে, যা আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন, অস্তিত্ব দিয়েছেন এবং বিস্তৃত করেছেন।

মোটকথা, যাদুর উল্লিখিত তিনটি প্রকারই বাস্তবে সম্ভব।

যাদু ও মো'জেযার পার্থক্য ঃ পয়গম্বরগণের মো'জেযা ও ওলীদের কারামত দ্বারা যেমন অস্বাভাবিক ও অলৌকিক ঘটনাবলী প্রকাশ পায়, যাদুর মাধ্যমেও বাহ্যত তেমনি প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। ফলে মূর্খেরা বিভ্রান্তিতে পতিত হয়ে যাদুকরদেরকেও সম্মানিত ও মাননীয় মনে করতে থাকে। এ কারণে এতদুভয়ের পার্থক্য বর্ণনা করা দরকার।

বলা বাহুল্য, প্রকৃত সত্তার দিক দিয়ে এবং বাহ্যিক প্রতিক্রিয়ার দিক দিয়ে এত-দুভয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। সত্তার পার্থক্য এই যে, যাদুর প্রভাবে সৃষ্ট ঘটনাবলীও কারণের আওতা-বহির্ভূত নয়। পার্থক্য শুধু কারণটি দৃশ্য কিংবা অদৃশ্য হওয়ার মধ্যে। যেখানে কারণ দৃশ্যমান, সেখানে ঘটনাকে কারণের সাথে সম্পৃক্ত করে দেওয়া হয় এবং ঘটনাকে মোটেই বিস্ময়কর মনে করা হয় না। কিন্তু যেখানে কারণ অদৃশ্য, সেখানেই ঘটনাকে অদ্ভুত ও আশ্চর্যজনক মনে করা হয়। সাধারণ লোক 'কারণ' না জানার দরুন এ ধরনের ঘটনাকে অলৌকিক মনে করতে থাকে। অথচ বাস্তবে তা অন্যান্য অলৌকিক ঘটনারই মত। কোন দূরদেশ থেকে আজকের লেখা পত্র হঠাৎ সামনে পড়লে দর্শকমাত্রই সেটাকে অলৌকিক বলে আখ্যায়িত করবে। অথচ জ্বিন ও শয়তানরা এ জাতীয় কাজের ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়েছে। মোটকথা এই যে, যাদুর প্রভাবে দৃষ্ট ঘটনাবলীও প্রাকৃতিক কারণের অধীন। তবে কারণ অদৃশ্য হওয়ার দরুন মানুষ অলৌকিকতার বিভ্রান্তিতে পতিত হয়।

মো'জেযার অবস্থা এর বিপরীত। মো'জেযা প্রত্যক্ষভাবে আল্লাহ্ তা'আলার কাজ। এতে প্রাকৃতিক কারণের কোন হাত নেই। ইবরাহীম (আ)-এর জন্য নমরূদের জ্বালানো আগুনকে আল্লাহ্ তা'আলাই আদেশ করেছিলেন, ইবরাহীমের জন্য সুশীতল হয়ে যাও। কিন্তু এতটুকু শীতল নয় যে, ইব্‌রাহীম কষ্ট অনুভব করে।' আল্লাহ্‌র এই আদেশের ফলে অগ্নি শীতল হয়ে যায়।

ইদানিং কোন কোন লোক শরীরে ভেষজ প্রয়োগ করে আগুনের ভেতর চলে যায়। এটা মো'জেযা নয়; বরং ভেষজের ক্রিয়া। তবে ভেষজটি অদৃশ্য, তাই মানুষ একে অলৌকিক বলে ধোঁকা খায়।

স্বয়ং কোরআনের বর্ণনা দ্বারা বোঝা যায় যে, মো'জেযা সরাসরি আল্লাহ্‌র কাজ। বলা হয়েছে—

وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى

অর্থাৎ—আপনি যে একমুষ্টি কঙ্কর নিক্ষেপ করেছিলেন, প্রকৃতপক্ষে তা আপনি নিক্ষেপ করেন নি; আল্লাহ্ নিক্ষেপ করেছিলেন। অর্থাৎ, এক মুষ্টি কংকর যে সমবেত সবার চোখে পৌঁছে গেল, এতে আপনার কোন হাত ছিল না। এটা ছিল একান্তভাবেই আল্লাহ্‌র কাজ। এই মো'জেযাটি বদর যুদ্ধে সংঘটিত হয়েছিল। রসূলুল্লাহ্ (সা) এক মুষ্টি কঙ্কর কাফের বাহিনীর প্রতি নিক্ষেপ করেছিলেন যা সবার চোখেই পড়েছিল।

মো'জেযা প্রাকৃতিক কারণ ছাড়াই সরাসরি আল্লাহ্‌র কাজ আর যাদু অদৃশ্য প্রাকৃতিক কারণের প্রভাব। এ পার্থক্যটিই মো'জেযা ও যাদুর স্বরূপ বোঝার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু তা সত্ত্বেও এখানে একটি প্রশ্ন থেকে যায় যে, সাধারণ লোক এই পার্থক্যটি কিভাবে

বুঝবে ? কারণ, বাহ্যিক রূপ উভয়েরই এক। এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, সাধারণ লোকদের বোঝার জন্যও আল্লাহ্ তা'আলা কয়েকটি পার্থক্য প্রকাশ করেছেন।

প্রথমত, মো'যেজা ও কারামত এমন ব্যক্তিবর্গের দ্বারা প্রকাশ পায়, যাদের খোদাভীতি, পবিত্রতা, চরিত্র ও কাজকর্ম সবার দৃষ্টির সামনে থাকে। পক্ষান্তরে যাদু তারাই প্রদর্শন করে, যারা নোংরা, অপবিত্র এবং আল্লাহ্‌র যিক্‌র থেকে দূরে থাকে। এসব বিষয় চোখে দেখে প্রত্যেকেই মো'জেযা ও যাদুর পার্থক্য বোঝতে পারে।

দ্বিতীয়ত, আল্লাহ্‌র চিরাচরিত রীতি এই যে, যে ব্যক্তি মো'জেযা ও নবুয়ত দাবী করে যাদু করতে চায়, তার যাদু প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে না। হাঁ, নবুয়তের দাবী ছাড়া যাদু করলে তা প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

পয়গম্বরগণের উপর যাদু ক্রিয়া করে কিনা ? এ প্রশ্নের উত্তর হবে হাঁ-বাচক। কারণ, পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, যাদু প্রকৃতপক্ষে প্রাকৃতিক কারণের প্রভাব। পয়গম্বরগণ প্রাকৃতিক কারণের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হতেন। এটা নবুয়তের মর্যাদার পরিপন্থী নয়। সবাই জানেন, বাহ্যিক কারণ দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে পয়গম্বরগণ ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর হতেন, রোগাক্রান্ত হতেন এবং আরোগ্য লাভ করতেন। তেমনিভাবে যাদুর অদৃশ্য কারণ দ্বারাও তাঁরা প্রভাবান্বিত হতে পারেন এবং এটা নবুয়তের পরিপন্থী নয়। সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে যে, ইহুদীরা রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপর যাদু করেছিল এবং সে যাদুর কিছু প্রতিক্রিয়াও প্রকাশ পেয়েছিল। ওহীর মাধ্যমে তা জানা সম্ভব হয়েছিল এবং যাদুর প্রভাব দূরও করা হয়েছিল। মূসা (আ)-র যাদুর প্রভাবে প্রভাবান্বিত হওয়া কোরআনেই উল্লিখিত রয়েছে :

يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ এবং فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُّوسَىٰ

যাদুর কারণেই মূসা (আ)-র মনে ভীতির সঞ্চার হয়েছিল।

শরীয়তে যাদু সম্পর্কিত বিধি-বিধান

পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে, কোরআন ও হাদীসের পরিভাষায় যাদু এমন অদ্ভুত কর্মকাণ্ড, যাতে কুফর, শিরক এবং পাপাচার অবলম্বন করে জিন ও শয়তানকে সন্তুষ্ট করা হয় এবং ওদের সাহায্য নেওয়া হয়। কোরআনে বর্ণিত বাবেল শহরের যাদু ছিল তাই।——(জাসসাস) এ যাদুকেই কোরআন কুফর বলে অভিহিত করেছে। আবু মনসুর (রা) বলেন, বিশুদ্ধ অভিমত এই যে, যাদুর সকল প্রকারই কুফর নয়; বরং যাতে ঈমানের বিপরীত কথাবার্তা এবং কাজকর্ম অবলম্বন করা হয়, তাই কুফর।——(রূহুল মা'আনী)

শয়তানকে অভিসম্পাত করা এবং শয়তানের বিরোধিতা করার নির্দেশ কোরআনে বারবার উল্লিখিত হয়েছে। এর বিপরীতে শয়তানের সাথে সম্পর্ক স্থাপন এবং ওকে সন্তুষ্ট করার চিন্তা করা কঠিন গোনাহর কাজ। তদুপরি শয়তান তখনই সন্তুষ্ট হবে, যখন মানুষ ঈমান বিধ্বংসী কুফর ও শিরকে অথবা পাপাচারে লিপ্ত হবে এবং আল্লাহ্ ও ফেরেশতাদের পছন্দের বিপরীতে নোংরা ও অপবিত্র থাকবে। যাদুর সাহায্যে অনর্থক কারও ক্ষতি করলে তা হয় অধিকতর গোনাহ।

মোটকথা, কোরআন ও হাদীসে যাকে যাদু বলা হয়েছে, তা বিশ্বাসগত কুফর অথবা অন্তত কার্যগত কুফর থেকে মুক্ত নয়। শয়তানকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশে কিছু শিরক ও কুফরী বাক্য বললে অথবা পন্থা অবলম্বন করলে, তা হবে প্রকৃত বিশ্বাসগত কুফর। পক্ষান্তরে এসব থেকে আত্মরক্ষা করে অপরাপর গোনাহ্ অবলম্বন করা হলে, তা কার্যগত কুফর থেকে মুক্ত হবে না। কোরআন মজীদের আয়াতসমূহে এ কারণেই যাদুকে কুফর বলা হয়েছে।

মোটকথা, শিরক ও কুফরযুক্ত যাদু যে কুফর, সে বিষয়ে 'ইজমা' রয়েছে। যেমন, শয়তানের সাহায্য লওয়া, গ্রহ ও নক্ষত্রের প্রভাব স্বতন্ত্রভাবে স্বীকার করা, যাদুকে মো'জেযা আখ্যা দিয়ে নবুয়ত দাবী করা ইত্যাদি। পক্ষান্তরে গোনাহযুক্ত যাদু কবীরা গোনাহ্।

০ বিশ্বাসগত অথবা কার্যগত কুফর থেকে মুক্ত নয়—এমন যাদু শিক্ষা করা, শিক্ষা দেওয়া এবং তার আমল করা হারাম। তবে মুসলমানদের ক্ষতি দূর করার উদ্দেশ্যে প্রয়োজন অনুপাতে যাদু শিক্ষা করা কোন কোন ফিকাহ্‌বিদের মতে জায়েয।

০ কোরআন ও সুন্নাহ্‌র পরিভাষায় যেগুলোকে যাদু বলা হয়, সেগুলো ছাড়া অন্যান্য যাদুর মধ্যেও কুফর ও শিরক অবলম্বন করা হলে তাও হারাম।

০ তাবীজ-গণ্ডায় জ্বিন ও শয়তানের সাহায্য নেওয়া হলে তাও যাদুর মতই হারাম। যদি অস্পষ্টতার কারণে বাক্যাবলীর অর্থ জানা না যায় এবং যেসব শব্দ দ্বারা শয়তানের সাহায্য লওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তবে তাও হারাম।

০ অনুমোদিত ও জায়েয বিষয়াদির সাহায্যে হলে এবং তা অবৈধ উদ্দেশ্য হাসিলে ব্যবহার না করার শর্তে জায়েয।

০ কোরআন ও হাদীসের বাক্যাবলীর সাহায্যে হলেও যদি তা অবৈধ উদ্দেশ্য হাসিলে ব্যবহার করা হয়, তবে জায়েয নয়। উদাহরণত কারো ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে তাবীজ করা অথবা ওযীফা পাঠ করা। এহেন ওযীফা আল্লাহ্‌র নাম ও কোরআনের আয়াত সম্বলিত হলেও তা হারাম। (কাযী খান ও শামী)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا ۗ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٠٤﴾

(১০৪) হে মু'মিনগণ, তোমরা 'রায়িনা' বলো না—উনযুরনা' বল এবং শুনতে থাক আর কাফিরদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

[কোন কোন ইহুদী রসূলুল্লাহ্ (সা)]-এর নিকট এসে দুরভিসন্ধিমূলকভাবে তাঁকে 'রায়িনা' বলে সম্বোধন করত। হিব্রু ভাষায় এর অর্থ একটি বদদোয়া। তারা এ নিয়তেই তা বলত। কিন্তু আরবী ভাষায় এর অর্থ হচ্ছে 'আমাদের প্রতি লক্ষ্য করুন।' ফলে আরবী ভাষীরা তাদের এই দুরভিসন্ধি বুঝতে পারত না। ভাল অর্থের প্রতি লক্ষ্য করে কোন কোন মুসলমানও রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে এই শব্দে সম্বোধন করতেন। এতে দুষ্টরা আরও আশকারা পেতো। তারা পরস্পর বসে হাসাহাসি করত আর বলত, এতদিন আমরা গোপনেই তাকে মন্দ বলতাম। এখন এতে মুসলমানদেরও শরীক হওয়ার কারণে প্রকাশ্যে মন্দ বলার সুযোগ এসেছে। তাদের এই সুযোগ নষ্ট করার উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদের নির্দেশ দিচ্ছেন;) হে মু'মিনগণ, তোমরা 'রায়িনা' (শব্দটি) বলো না। (এর পরিবর্তে) 'উনযুরনা' বলবে। (কেননা, আরবী ভাষায় 'রায়িনা' ও 'উনযুরনা'র অর্থ এক হলেও 'রায়িনা' বললে ইহুদীরা দুষ্টামির সুযোগ পায়। তাই একে বর্জন করে অন্য শব্দ ব্যবহার কর)। আর এ নির্দেশটি (ভালরূপে) শুনে নাও (এবং স্মরণ রাখ)। কাফিরদের জন্যে তো বেদনাদায়ক শাস্তি রয়েছেই। (কারণ, ওরা ধূর্ততা সহকারে পয়গম্বরের প্রতি ধৃষ্টতা প্রদর্শন করে)।

আয়াত দ্বারা বোঝা যায় যে, আপনার কোন জায়েয কাজ থেকে যদি অন্যরা নাজায়েয কাজের আশকারা পায়, তবে সে জায়েয কাজটিও আপনার পক্ষে জায়েয থাকবে না। উদাহরণত কোন আলেমের কোন কাজ দেখে যদি সাধারণ লোকেরা বিভ্রান্ত হয় এবং নাজায়েয কাজে লিপ্ত হয়, তবে সে আলেমের জন্য সে জায়েয কাজটিও নিষিদ্ধ হয়ে যাবে। তবে শর্ত এই যে, সংশ্লিষ্ট কাজটি শরীয়তের দৃষ্টিতে অপ্রয়োজনীয় হওয়া উচিত। কোরআন ও হাদীসে এর ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত রয়েছে। এর একটি প্রমাণ ঐ হাদীস, যাতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, জাহেলিয়াত যুগে কোরাইশরা যখন কা'বাগৃহ পুনর্নির্মাণ করে, তখন এতে কয়েকটি কাজই এমন করা হয়েছে, যা ইব্রাহীম (আ) কর্তৃক রচিত ভিত্তির সাথে সামঞ্জস্যশীল নয়। আমার মন চায়, একে ভেঙে আবার ইব্রাহীমী ভিত্তির অনুরূপ করে দেই। কিন্তু কা'বাগৃহ ভেঙে দিলে অজ্ঞ জনগণের বিভ্রান্ত হওয়ার আশংকা রয়েছে। তাই আমি স্বীয় আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়িত